নিজে পড়ি

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কিছু কথা

ভাষাবিকাশের পথে শিক্ষার্থীদের ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় সপ্তম পাঠমালার বিষয়সূচীতে প্রাচীন সাহিত্যের বাংলা ভাষার কিছু রূপ-নমুনা পরিবেশিত হয়েছে। এবার তারা প্রাচীন সাহিত্য পড়বার এবং বোঝবার ক্ষমতা অর্জন করতে শিখবে।

লেখক-লেখিকাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও যথাসম্ভব দেওয়া হয়েছে, যাতে ঐতিহ্যময় বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা ক্রমশঃ পরিচিত হতে পারে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাও তারা এই পাঠমালায় চর্চা করবে এবং বুঝতে পারবে, বাংলা ভাষার অগ্রগতি কত দ্রুত।

মধ্যশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিমূর্ত চিন্তা করতে এবং ভাবধারা প্রকাশ করতে শেখে, সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি ভাব-মূলক কবিতা সংকলিত হল। ফলে, ছোটবেলা থেকে কবিতার ভাবঘন ভাষার গভীরতা উপলব্ধির চর্চা করতে শিখবে তারা। কবিতাগুলি পাঠ করলে তাদের মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি জাগে, তা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করবারই উৎসাহ জাগাতে হবে।

গদ্যাংশগুলি পাঠ করার পরে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু কতখানি উপলব্ধি করেছে, তা যাচাই করতে হবে অনুশীলনীর মাধ্যমে। যথেষ্ট পরিমাণে নমুনা-অনুশীলনী প্রত্যেকটি গদ্য ও কবিতার শেষে দেওয়া হয়েছে; যাঁরা পড়াবেন, তাঁরা আরও অনুশীলনী-প্রশ্ন গড়ে নিতে পারবেন।

পাঠক্রমে নির্ধারিত ব্যাকরণের কিছু আনুষঙ্গিক অনুশীলনীও বিষয়বস্তুর সামিল করা হয়েছে। এমনি আরও অনুশীলনী আছে 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' সপ্তম অনুশীলনী গ্রন্থটিতে — যেটি এই পাঠমালাটির পরিপূরক ও সহায়ক পুস্তিকা।

পাঠ্যাংশগুলির প্রারম্ভে লেখক-জীবনটীকা সংগ্রহের কাজে ডঃ অশোক কুমার কুণ্ডু মহাশয়ের সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজে পড়ি

৭

সপ্তম পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্ট লংম্যান

© ১৯৮৭ ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস

৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস

কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২

১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২

১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২

৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

জামাল রোড, পাটনা ৮০০ ০০১

ISBN 0 86131 719 X

চিত্রশিল্পী : কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭

প্রকাশক :

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,

কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রক :

প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড

৫২/৩ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা ৭০০ ০১২

সূচীপত্র

আকবর শা

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

(১৮৩৩-১৮৬৬) ঃ জন্ম—কামারপুকুর, হুগলী। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। বাল্যনাম ছিল 'গদাধর'। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ বিশেষ হয়নি। দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে পূজারী ছিলেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য তিনি সকলকে গল্পের মাধ্যমে সহজভাবে নীতিশিক্ষা দিতেন।

এক ফকির বনে কুটির ক'রে থাকত। তখন আকবর শা দিল্লীর বাদশা। ফকিরের কাছে অনেকে আসত। অতিথি সৎকারে তার বড় ইচ্ছা হয়।

একদিন ভাবল যে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন ক'রে অতিথি-সৎকার হয়! তবে যাই একবার আকবর শা'র কাছে। সেখানে সাধু ফকিরের অবারিত দ্বার। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন। ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসল।

দেখল, আকবর শা নমাজের শেষে বলছেন, 'হে আল্লা, ধন দাও দৌলত দাও'— আরো কত কি!

এই সময়ে ফকিরটি উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল। আকবর শা ইশারা ক'রে বসতে বললেন।



নমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এসে বসলেন, আবার চলে যাচ্ছেন ?'

ফকির বলল, 'সে আর মহারাজের শুনে কাজ নেই, আমি চললাম।'

বাদশা অনেক জিদ করাতে ফকির বলল, 'আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা করতে এসেছিলাম।'

আকবর শা বললেন, 'তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন ?'

ফকির বলল, 'যখন দেখলাম তুমিও ধন দৌলতের ভিখারী,—তখন মনে করলাম যে, ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কী হবে? চাইতে হয় তো আল্লার কাছেই চাইব।'

অনুশীলনী

১। আকবর শা কত বছর আগে এদেশের বাদশা ছিলেন? জেনে নিয়ে লেখো।

২। ফকির আকবর শা-র কাছে কেন গিয়েছিলেন?

৩। ফকির কেন আকবর শা-র নমাজের ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন?

৪। মানে লেখো ঃ

অবারিত দ্বার, অতিথি সৎকার, প্রার্থনা, দৌলত।

৫। সম্বন্ধ পদ বসিয়ে ফাঁক পূরণ করো ঃ

(ক) তখন আকবর শা ———— বাদশা।

(খ) ফকির ———— ঘরে গিয়ে বসল।

(গ) সে আর ———— শুনে কাজ নেই।

(ঘ) ———— কাছে চেয়ে আর কী হবে ?

(ঙ) চাইতে হয় তো ———— কাছেই চাইব।

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে যা জানো তা দশ লাইনের মধ্যে লেখো।

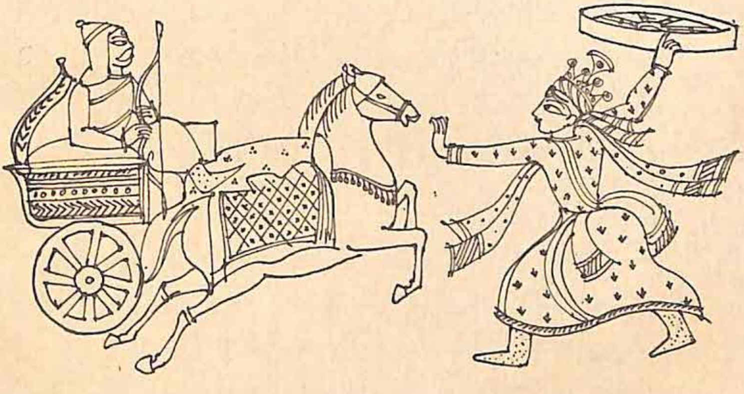
৭। 'যখন দেখলাম তুমিও ধনদৌলতের ভিখারী, তখন মনে করলাম যে ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কী হবে? চাইতে হয় তো আল্লার কাছেই চাইব।' —ফকির একথা বলে কি ঠিক করেছিলেন, না, ভুল করেছিলেন? কেন?

ভীষ্মপর্ব থেকে

কাশীরাম দাস

আনুমানিক খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত মহাভারতের কিছুটা বাংলা পদ্যে অনুবাদ ক'রে বিখ্যাত হন। জন্ম—সিঙ্গীগ্রাম, বর্ধমান। পিতা কমলাকান্ত। এই অংশটি তার 'ভীষ্মপর্ব' থেকে নেওয়া হয়েছে।

অস্থির হইলা হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥



গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বসুমতী॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ॥

সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্বলোকে॥
শীঘ্র এস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার॥

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা করো ঃ

'অস্থির হইলা হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন॥'

(ক) হরি কমললোচন কে ? (খ) দৃশ্যটি কে বর্ণনা করছেন ?
(গ) মহাভারতের কোন্ অংশে এটি আছে ?

২। 'কৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বসুমতী॥'

(ক) সেই সময়ে কেন শ্রীকৃষ্ণের এই ভাব হয়েছিল ?
(খ) তাঁর সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে ?

৩। ভীষ্ম নির্ভয়ে রথের ওপর বসে কী ভাবছিলেন ?

৪। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে পাঁচালীর মতন আবৃত্তি করো।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ করো ঃ

আসিছে ——— মারিতে ———।
——— আমারে যেন ——— ———॥

৬। অর্থ লেখো ঃ

কমললোচন, রথচক্র, ত্রিলোকের নাথ, গজেন্দ্র, মৃগপতি, বসুমতী, চমৎকৃত, সর্বজন, নারায়ণ, ধনুঃশর, ভুবনপতি, সংহার, তরি, ভব।

৭। কবিতাটির সারাংশ লেখো।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

কমললোচন, রথচক্র, ত্রিলোক, ধনুঃশর, সর্বজন।

চতুর্স্ত্রিংশ উপাখ্যান

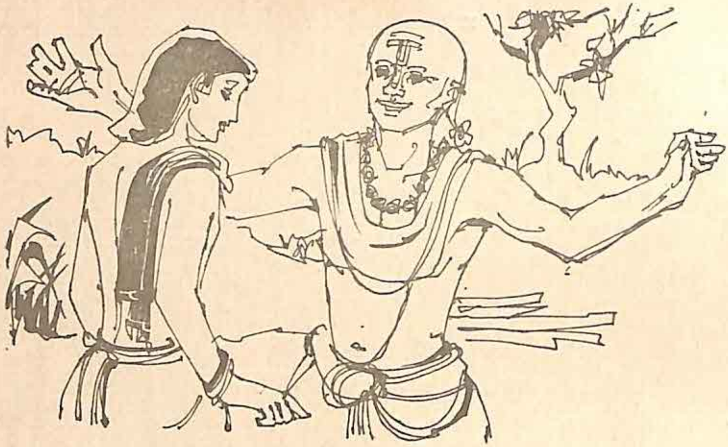
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০-১৮৯১)ঃ জন্ম—বীরসিংহা, হুগলী (বর্তমান মেদিনীপুরে)। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অতি অল্পবয়সে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। 'বর্ণ পরিচয়' এবং অনেক বাংলা বই লিখে বাংলাভাষার উন্নতি করেন। এই উপাখ্যানটি তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বই থেকে নেওয়া। বইখানি সংস্কৃত 'বেতাল পঞ্চবিংশক' অবলম্বনে তিনি লেখেন। ২৫টি গল্পের ভিত্তি হল—রাজা বিক্রমাদিত্যকে বেতালের ২৫টি প্রশ্ন।

বেতাল কহিল, মহারাজ, কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্ম্মা নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অনেক কাল অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুত্র অল্পকাল মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইল এবং অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যধর্ম্মা হইয়া নিরন্তর পিতা-মাতার সেবা করিতে লাগিল।

পিতা-মাতার ভাগ্যদোষে ঐ পুত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। তাহার পিতা-মাতা প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন; পরিশেষে অগ্নিসংস্কারার্থ গ্রামের উপান্তবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতারচনা করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ যোগী বহুকাল অবধি ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মৃত কলেবর পতিত দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'আমার এই প্রাচীন দেহ, জরায় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া কার্য্যাক্ষম হইয়াছে; অতএব এই যুবার দেহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে বহুকাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব।' এই বলিয়া জগদীশ্বরের নামস্মরণপূর্ব্বক যোগী সেই যুবার কলেবরে প্রবেশ করিলেন।



ব্রাহ্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞশর্ম্মা. পুত্রকে প্রত্যাগত জীবিত দেখিয়া প্রথমতঃ প্রফুল্ল বদনে হাস্য করিলেন; কিন্তু এক নিমেষ পরেই বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, 'মহারাজ, পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টমনে হাস্য করিয়া কি কারণে পরক্ষণেই রোদন করিলেন, বল।'

রাজা কহিলেন. 'ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ পুত্রকে পুনর্জীবিত বোধ করিয়া আহ্লাদে হাস্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরকলেবর-প্রবেশিনী বিদ্যা জানিতেন, ঐ বিদ্যার প্রভাবে পরক্ষণেই জানিতে পারিলেন, পুত্র পুনর্জীবিত হয় নাই; যোগীর প্রবেশ দ্বারা এরূপ ঘটিয়াছে; এই জন্য রোদন করিলেন।'

ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্ব্বার বৃক্ষোপরি গিয়া লম্বমান হইলে, রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে অবতরণপূর্ব্বক স্কন্ধে লইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

অনুশীলনী

১। কলিঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ যজ্ঞশর্মার পুত্রের গুণের বর্ণনা দাও।

২। আঠারো বছর বয়সে ছেলেটির হঠাৎ মৃত্যু হলে তার বাবা এবং মা শেষ পর্যন্ত ছেলেটিকে চিতায় ওঠাতে গেলেন কেন?

৩। শ্মশানের যোগী কেন এই যুবকের দেহে প্রবেশ করতে চাইলেন?

৪। ব্রাহ্মণপুত্রের মৃতদেহ জীবিত হয়ে উঠলে প্রথমে কেন তার বাবা খুশি হলেন এবং পরে কাঁদতে লাগলেন?

৫। বেতালের প্রশ্নের উত্তরে রাজা বিক্রমাদিত্য যা বললেন তা সত্য প্রমাণিত হবার পর রাজা বেতালকে নিয়ে কোথায় গেলেন?

৬। মানে লেখো ঃ

পারদর্শী, অনন্যকর্ম্মা, অনন্যধর্ম্মা, কালগ্রাস, যৎপরোনাস্তি, বিলাপ, পরিতাপ, উপান্তবর্ত্তী, যোগাভ্যাস, কার্য্যাক্ষম।

৭। অর্থ লেখো ঃ

জগদীশ্বর, কলেবর, প্রবৃত্ত, হৃষ্টমনে, পুনর্জীবিত।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

যোগাভ্যাস, প্রত্যাগত, পুনর্জীবিত, কার্য্যাক্ষম, পুনর্ব্বার, আশ্রমাভিমুখে, নিরন্তর, জগদীশ্বর, বৃক্ষোপরি।

গৌরীর সঙ্গে মেনকার কলহ

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

আনুমানিক ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে চণ্ডীকাব্য রচনা ক'রে ইনি মেদিনীপুরের রাজা বাঁকুড়া দেবের কাছ থেকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। জন্ম—দামুন্যা, বর্ধমান। পিতা হৃদয় মিশ্র। কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কল্পনাগুণে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখি পুষিব কত কাল॥
প্রভাতে খাবার সঙ্গে কার্ত্তিক গণাই।
চারি কড়ার সম্ভবনা তোর ঘরে নাই॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ ছাল।
সবে ধন বুড়া বৃশ গলে হাড়মাল॥
প্রেত পিশাচ ভূত নিরবধি সঙ্গ।
শাশুড়ী হয়ে কত কিনে দিব ভঙ্গ॥
অভাগ্যেতে ঘটিছে সদাই উৎপাত।
রান্ধিয়া বাড়িয়া কাঁকালে হৈল বাত॥
যদি দুগ্ধ উতলয়ে নাহি দেও পানী।
পাশা খেল সবে মিলি দিবস রজনী॥
মিথ্যা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাস বাস।
ভাত কাপড় কত যোগাব বার মাস॥



অনুশীলনী

১। গৌরীর সঙ্গে মেনকার ঝগড়ার কারণ কি? গৌরীর বাঘছাল-পরা স্বামীটি কে?

২। ব্যাখ্যা করো ঃ

মিথ্যা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাস বাস।
ভাত কাপড় কত যোগাব বার মাস॥

৩। বাক্য তৈরি করো ঃ

উৎপাত, রজনী, মিথ্যা, ভাত-কাপড়, প্রভাত।

৪। কবিতাটির প্রথম ছ'লাইন মুখস্থ বলো।

৫। সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখো ঃ

গিরিয়াল, গণাই, বুড়া বৃশ, মেনকা।

জাহাজে যেতে যেতে

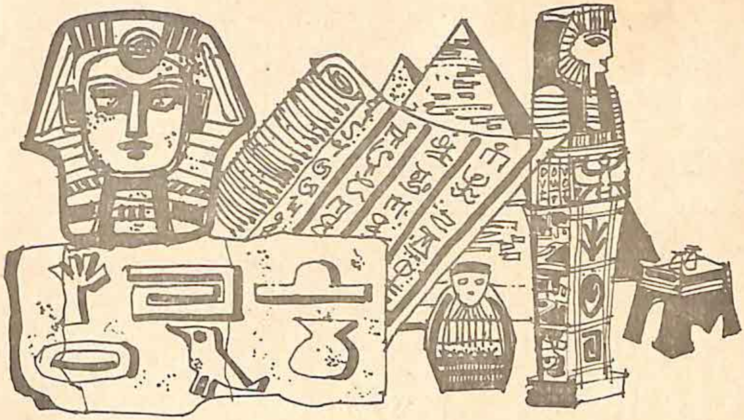
স্বামী বিবেকানন্দ

(১৮৬২-১৯০২) ঃ জন্ম—সিমুলিয়া, কলকাতা। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত। বাল্যনাম 'বিশ্বেশ্বর', পরে 'নরেন্দ্রনাথ'। অসাধারণ স্মরণশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধা ছিল। কলেজ থেকে পাস ক'রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং সন্ন্যাসী হন। তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য পৃথিবীর নানাদেশ ভ্রমণ করেন।

জাহাজ তো রেড-সীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাদ্রী বললেন, 'এই—এই রেড-সী, য়াহুদী-নেতা মুসা সদলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন, আর তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে মিশরী বাদশা 'ফেরো' যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, তারা কাদায় রথচক্র ডুবে — কর্ণের মতো আটকে — জলে ডুবে মারা গেল।

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেছে, এই রেড-সীর কিনার — প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র; ঐ-ওপারে আরবের মরুভূমি ঃ এপারে— মিশর, এই সেই প্রাচীন মিশর; এই মিশরীরা পন্ট্ দেশ (সম্ভবত মালাবার) হতে রেড-সী পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার ক'রে উত্তরে পৌঁছেছিল। এদের আশ্চর্য শক্তি বিস্তার, রাজ্যবিস্তার, সভ্যতাবিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য।

এদের বাদশাদের পিরামিড নামক আশ্চর্য সমাধিমন্দির, নারী-সিংহী মূর্তি। এদের মৃতদেহগুলি পর্যন্ত আজও বিদ্যমান, বাবরি কাটা চুল; কাছাহীন ধপধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিশরী লোক সব; এই দেশে বাস করত, এই হিক্‌স বংশ, ফেরো বংশ, ইরানী বাদশাহি, সিকন্দর, টলেমি বংশ এবং রোমক ও আরব বীরদের রঙ্গভূমি — মিশর। সেই কতকাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্ পত্রে, পাথরে মাটির বাসনের গায়ে চিত্রাক্ষরে তন্ন তন্ন ক'রে



লিখে গেছে। এই ভূমিতেই আইসিসের পূজা, হোরসের প্রাদুর্ভাব।

এই প্রাচীন মিশরীদের মতে — মানুষ ম'লে তার সূক্ষ্ম শরীর বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃতদেহের কোন অনিষ্ট হলেই সূক্ষ্ম শরীরে আঘাত লাগে আর মৃত শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ, তাই শরীর রাখবার এত যত্ন। তাই রাজা-বাদশাদের পিরামিড, কত কৌশল! কী পরিশ্রম!

সবই আজ বিফল! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলে রাস্তার রহস্য ভেদ ক'রে রত্নলোভে দস্যুরা সে রাজ-শরীর চুরি করেছে, আজ নয়, প্রাচীন মিশরীরা নিজেরাই করেছে। পাঁচ-সাত-শ বৎসর আগে এই সকল শুকনো মড়া — য়াহুদী ও আরব ডাক্তারেরা মহৌষধি-জ্ঞানে ইওরোপ-সুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত, এখনও উহা বোধ হয় ইউনানি হাকিমির আসল 'মামিয়া'!!

এই মিশরে টলেমি বাদশার সময়ে সম্রাট ধর্মাশোক ধর্মপ্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম প্রচার করত, রোগ ভালো করত, নিরামিষ খেত, বিবাহ করত না। সন্ন্যাসী শিষ্য করত, তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল — থেরাপিউট, অসসিনি, মানিকি ইত্যাদি — যা হতে বর্তমান ক্রিশ্চানি ধর্মের সমুদ্ভব।

এই মিশরই টলেমিদের রাজত্বকালে সর্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিল, এই মিশরেই সে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর, যেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল, সে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চানদের হাতে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল — পুস্তকালয় ভস্মরাশি হল — বিদ্যার সর্বনাশ হল।

আর দক্ষিণে — বীরপ্রসূ আরবের মরুভূমি। কখনো আলখাল্লা-ঝোলানো-পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল আঁটা — বদ্দু আরব দেখেছ? সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনো দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্ছে।

অনুশীলনী

১। জাহাজ যখন রেড-সীর ওপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন পাদ্রী, য়াহুদী নেতা মুসা সম্পর্কে কী কাহিনী শোনালেন?

২। ...'এই রেড-সীর কিনার — প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র, ঐ পারে আরবের মরুভূমি ঃ এপারে মিশর'......এই দুই সভ্যতা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ যা লিখেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখো।

৩। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ

(ক) পিরামিড, (খ) নারীসিংহী মূর্তি, (গ) পাপিরস্ পত্র, (ঘ) আইসিসের পূজা, (ঙ) টলেমি।

৪। অতীতের আলেকজেন্দ্রিয়া নগর কেমন ছিল?

৫। বীরপ্রসূ আরবের সে সময়কার আরবদের বিবেকানন্দ কী চোখে দেখেছিলেন?

৬। মানে লেখো ঃ

পদব্রজে, রথচক্র, বিদ্যমান, চিত্রাক্ষর, সূক্ষ্ম শরীর, মহৌষধি, সমুদ্ভব, বিদ্বজ্জন, আপাদমস্তক, অনবরুদ্ধ।

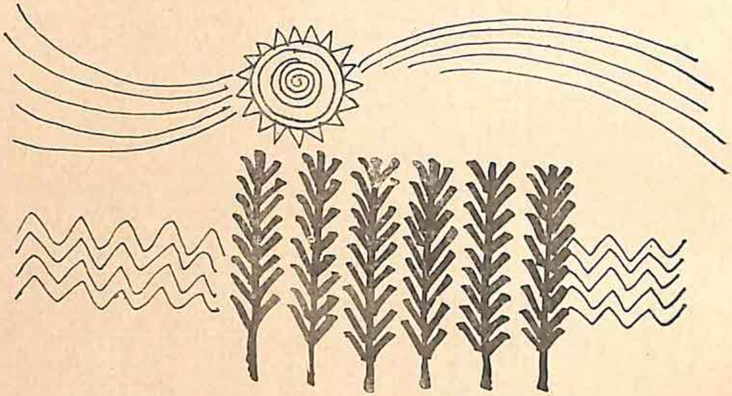
৭। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

চিত্রাক্ষর, মহৌষধি, বিদ্বজ্জন, ধর্মাশোক, স্বাধীনতা, পুস্তকাগার, বিদ্যালয়, পুস্তকালয়।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

আপাদমস্তক, জগৎপ্রসিদ্ধ, মরুভূমি, রত্নলোভ, অনিষ্ট, ভস্মরাশি, অনবরুদ্ধ, বীরপ্রসূ।

ডাক ও খনার বচন



ভালো দ্রব্য যখন পাব
কালিকারে তুলিয়া না থোব।
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব যোগ॥
বলে ডাক এই সংসার
আপনা মইলে কিসের আর॥

দিনে রোদ রাতে জল
তাতে বাড়ে ধানের বল।
কার্তিকের ঊনজলে
খনা বলে, দুনো ফলে॥

খনা ডেকে ব'লে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥

অনুশীলনী

১। আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচলিত প্রবাদ — ডাক ও খনার বচন সম্পর্কে যা জান লেখো।

২। 'ভালো দ্রব্য যখন পাব। কালিকারে তুলিয়া না থোব।'—ব্যাখ্যা করো।

৩। 'বচন'গুলির মানে গদ্যে লেখো।

৪। 'বচন'গুলি মুখস্থ করো এবং সময় মতো লাগসই কাজে লাগাও।

৫। আরও কিছু 'বচন' শিখে নাও এবং বন্ধুদের শেখাও।

৬। পদ পরিবর্তন করো ঃ

পাব (ক্রিয়া)→বিশেষ্য? খণ্ডাব (ক্রিয়া)→বিশেষণ ?

বাড়ে (ক্রিয়া)→বিশেষ্য? ফলে (ক্রিয়া)→বিশেষ্য ?

৭। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো ঃ

ভালো দ্রব্য যখন পাব। খনা ডেকে বলে যান।

তাতে বাড়ে ধানের বল। দিনে রোদ রাতে জল।

সহজ রচনাশিক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৩৮-১৮৯৪): জন্ম—কাঁঠালপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা যাদবচন্দ্র। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বাংলা ভাষায় অনেক বিখ্যাত উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন। 'বন্দেমাতরম' গানটি তাঁরই লেখা।

আমরা যাহা মনে করি, তাহা লোকের কাছে প্রকাশ করিতে হইলে, হয় মুখে মুখে বলি, নয় লিখিয়া প্রকাশ করি। মুখে মুখে বলিলে লোকে তাহাকে কথোপকথন, বা অবস্থাবিশেষে বক্তৃতা বলে। লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে, চিঠি, সংবাদপত্র, পুস্তক ইত্যাদিতে প্রকাশ করা যায়।

কিন্তু মুখেই বলি, আর লিখিয়াই বলি, বলিবার সময়ে কথাগুলি একটু সাজাইয়া লইতে হয়, সাজাইয়া না বলিলে, হয়ত তুমি যাহাকে বলিতেছ, সে তোমার সকল কথা বুঝিতে পারিবে না, নয়ত সে কথাগুলি গ্রাহ্য করিবে না, এই সাজানকে রচনা বলে।

রচনা অতি সহজ, মুখে মুখে কহিবার সময়েও আমরা সাজাইয়া কথা কই, তাহা না করিলে কেহ আমাদের কথা বুঝিতে পারিত না। অতএব যে মুখে মুখে কথোপকথন করিতে পারে, লিখিতে জানিলে সেও অবশ্য লিখিত রচনা করিতে পারে। তবে সকল কাজই অভ্যাসাধীন। মৌখিক রচনায় সকলেরই অভ্যাস আছে। লিখিত রচনায় যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাদিগকে অভ্যাস করিতে হইবে।

রচনার চারিটি গুণ বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে। এই চারিটির নাম—১) বিশুদ্ধি, ২) অর্থব্যক্তি, ৩) প্রাঞ্জলতা, ৪) অলঙ্কার।

প্রথমে বিশুদ্ধি। রচনার ভাষা শুদ্ধ না হইলে সব নষ্ট হইল। বিশুদ্ধির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ করিতে হইবে, বিশুদ্ধি সর্ব্বপ্রধান গুণ।

যাহা বিশুদ্ধ নহে, তাহা অশুদ্ধ……

মৌখিক রচনা যেরূপ, লিখিত রচনাও সেইরূপ; তবে কিছু প্রভেদ

আছে। লিখিত রচনা কতকগুলি নিয়মের অধীন, মৌখিক রচনা সে সব নিয়মের অধীন নয়, অথবা অধীন হইলেও মৌখিক রচনায় সে সকল নিয়ম লঙ্ঘনে দোষ ধরা যায় না। লিখিত রচনায় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে দোষ ধরিতে হয়, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলেই রচনা অশুদ্ধ হইল।

তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল। অর্থব্যক্তির বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে দুই একটা সঙ্কেত আছে।

যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভাল নয়, কি বিদেশী কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না। এক সময়ে লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিবে না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাঁহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।

প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে, যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা। কিন্তু অনেক লেখক এ কথা মনে রাখেন না। কতকগুলি নিয়ম, আর কতকগুলি কৌশল মনে রাখিলে রচনা খুব প্রাঞ্জল করা যায়। দুই রকমই বলিয়া দিতেছি।

একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম থাকিতে পারে, যেমন আগুনের নাম অগ্নি, হুতাশন অথবা হুতভুক্, অনল, বৈশ্বানর, বায়ুসখা ইত্যাদি। এখন, আগুনের কথা লিখিতে গেলে ইহার মধ্যে কোন্ নামটি ব্যবহার করিব ?—যেটি সবাই জানে, অর্থাৎ আগুন বা অগ্নি। যদি বলি 'হুতভুক্ সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়' তবে অধিকাংশ বাঙালী আমার কথা বুঝিবে না, যদি বলি যে, 'অগ্নির সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে' সকলেই বুঝিবে।

অনর্থক কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি সমাসের আড়ম্বর করিও না—অনেকে বুঝিতে পারে না। যদি বলি, 'মীনক্ষোভাকুল কুবলয়' —তোমরা কেহ কি সহজে বুঝিবে ? আর যদি বলি, 'মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপিতেছে', তবে কে না বুঝিবে ?

অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে, বেশী কথার প্রয়োজন কি ? 'এবম্বিধ বিবিধ প্রকার ভয়াবহ ব্যাপারের বশীভূত হইয়া, যখন সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে অধিষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় কিরণমালা প্রেরণ করিলেন, তখন আমি সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলাম।' এরূপ না বলিয়া যদি, 'এইরূপ অনেক বিষয়ে ভয় পাইয়া, যখন সূর্য উঠিল তখন আমি সেস্থান হইতে চলিয়া গেলাম', তবে অর্থের কোন ক্ষতি হয় না অথচ সকলে সহজে বুঝিতে পারে।

জটিল বাক্য রচনা করিও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র জড়িত করা হইলে বাক্য জটিল হয়। যেখানে বাক্য জটিল হইয়া আসিবে সেখানে জটিল বাক্যটি ভাঙিয়া ছোট ছোট সরল বাক্যে সাজাইবে। উদাহরণ দেখ :

'দিন দিন পল্লীগ্রাম সকলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে পল্লীগ্রাম যে জনহীন হইবে, এবং তদ্ধেতুক যে কৃষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ অনুমান করিয়াও অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করেন না, দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।'

এই বাক্য অতি জটিল। সহজে বুঝা যায় না, কিন্তু ছোট ছোট বাক্যে ইহাকে বিভক্ত করিয়া লইলে কত সহজ হয় দেখ :

'দিন দিন পল্লীগ্রাম সকলের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে। যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগ্রাম জলহীন হইবে। পল্লীগ্রামসকল জলহীন হইলে কৃষিকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে. অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহা অনুমান করিয়াছেন।

কিন্তু অনুমান করিয়াও তাঁহারা ইহার প্রতিবিধানের যত্ন করেন না। ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।'

একটি বাক্যের স্থানে ছয়টি হইয়াছে, কিন্তু বুঝিবার আর কোন কষ্ট নাই।...

অলঙ্কার ধারণ করিলে যেমন মনুষ্যের শোভা বৃদ্ধি পায়, অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও সেইরূপ শোভা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ বড় কঠিন। আর, সকল প্রকার রচনায় অলঙ্কারের সমাবেশ করা যায় না; বিশেষ, যাহারা প্রথম রচনা করিতে শিখে, তাহাদিগের পক্ষে অলঙ্কার প্রয়োগ করা বিধেয় নহে।

অনুশীলনী

১। আমরা যা মনে করি তা প্রকাশ করার দুটি মাধ্যম কী?

২। রচনার কী কী বিশেষ গুণ আমাদের শেখা দরকার?

৩। 'তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল'—কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র কী অর্থে বলেছেন বুঝিয়ে লেখো।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র সহজ রচনা কাকে বলছেন? তিনি সংস্কৃতবহুল, সন্ধি সমাসে ভরা বাক্য ব্যবহার করতে বারণ করছেন কেন?

৫। বাক্যে অলঙ্কারের ব্যবহার কেন কঠিন বলে লেখক মনে করেন?

৬। চারটি সরল বাক্য ব্যবহার ক'রে একটি বিষয় ব্যক্ত করো।

৭। অর্থ লেখো ঃ

গ্রাহ্য, অভ্যাসাধীন, প্রাঞ্জলতা, সর্ব্বাগ্রে, সংস্কৃতমূলক।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

অভ্যাসাধীন, সর্ব্বাগ্রে, ইত্যাদি, কথোপকথন, অলঙ্কার, সংস্কৃত, মনোযোগ, সঞ্চালিত, তদ্ধেতুক।

৯। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

বিশুদ্ধ, প্রকাশ, সহজ, গুণ, মৌখিক, বৃথা, ভালো, বিদেশী, উৎকৃষ্ট, ত্যাগ, অনর্থক, ছোট।

অন্নদামঙ্গল থেকে

ভারতচন্দ্র রায়

(আনুঃ ১১১৯-১১৬৭ বঃ): জন্ম—পেঁড়ো, হাওড়া। পিতা রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। দারিদ্র্যের মধ্যেও চোদ্দ বছর বয়সে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান আয়ত্ত করেন। পারসী ভাষা শেখেন। কৃষ্ণ-নগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তি পেয়ে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লেখেন এবং 'রায়গুণাকর' উপাধি পান। অন্নদামঙ্গল কাব্যের এই অংশে রাজা দক্ষের সঙ্গে তাঁর জামাতা মহাদেবের এক নিদারুণ সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। দক্ষ তাঁর এক যজ্ঞে মহাদেবকে অপমানের উদ্দেশ্যে তাঁকে এবং কন্যা সতীকে নিমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে বাদ দেন। খবর পেয়ে সতী নিমন্ত্রণ ছাড়াই সেখানে যান এবং যজ্ঞস্থলে স্বামী-নিন্দা সহ্য করতে না পেরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সেই খবর পেয়ে মহাদেব রুদ্ররূপ ধারণ করেন।



মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥

লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলটল কলক্কল তরঙ্গা ॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহাশব্দ গালে ॥...

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

অনুশীলনী

১। মহাদেবের রুদ্ররূপের বর্ণনা দাও।

২। ব্যাখ্যা করো ঃ

ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥

৩। অর্থ লেখো ঃ

জ্বলে বহ্নি ভালে; দক্ষ দে রে সতী রে; ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে সতী দে; মহাশব্দ গালে।

৪। বাক্য তৈরি করো ঃ

গঙ্গা, শিঙ্গা, গভীর, মহাশব্দ ,অদূরে।

৫। মিল দাও ঃ

ঘোর, ডাকে, জ্বলে, দক্ষ, ভারতী।

15152

মুন্‌শি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১) ঃ জন্ম—জোড়াসাঁকো, কলকাতা। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা সারা পৃথিবীতে সমস্ত ভাষায় পড়া হয়। সুন্দর কবিতার বই 'গীতাঞ্জলি' লিখে তিনি 'নোবেল পুরস্কার' পেয়েছিলেন। গান লিখেছেন দু'হাজারেরও বেশি। 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' জাতীয় সঙ্গীত তিনিই লিখেছিলেন।

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুন্‌শি, দাদাকে ফার্‌সি পড়াতেন। কাঠা-মোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় কখানার উপরে একটা চামড়া ছিল লেগে, যেন মোম-জামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে।

পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনো জেতে কখনো হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুন্‌শির ছিল গুমর, তাতে তিনি কখনো কারুর কাছে হটেন নি। তাঁর বিদ্যেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কম্‌তি, সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে।

যদি হত ফার্‌সি পড়া বিদ্যে, তাহলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজী ছিল লোকে। কিন্তু, ফার্‌সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিদ্যে!

কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চেঁচানি কিংবা কাঁদুনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু। তিনি কপাল চাপ্‌ড়িয়ে বলতেন, মুন্‌শিজি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুন্‌শি বিশেষ দুঃখিত হতেন না—একটু মুচকে

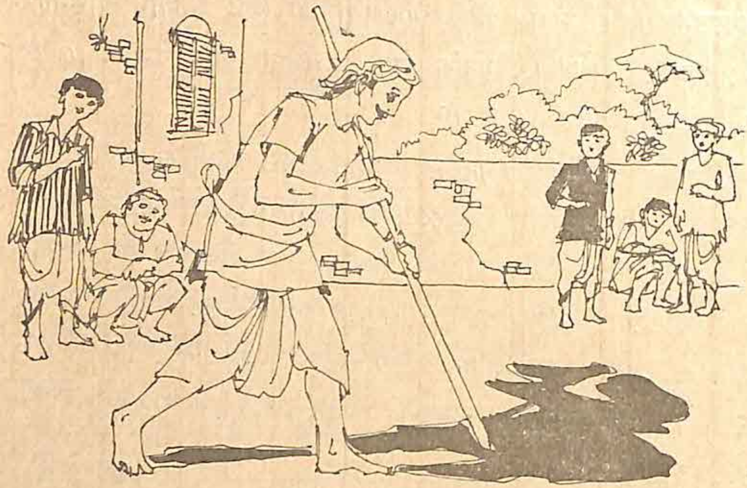
হাসতেন মাত্র। সবাই বলত, মুন্‌শিজী, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন! খোশনামটা মুন্‌শি নিজের পাওনা বলেই নিজের ট্যাঁকে গুঁজতেন। এই তো গেল গান।

আরও একটা বিদ্যে মুন্‌শির দখলে ছিল। তারও সমঝদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্ণুর কৃপায় বেঁচে গেল, সুরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুন্‌শি একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু, মুন্‌শির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপ-কর্মের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল একাডেমিতে, ডিক্রুজ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনা কোনো-কালেই হবে না। কিন্তু ভাবনা কী! আমাদের বিদ্যেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি।

তবুও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি ক'রে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্রুজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না।

মুন্‌শিকে জানাতুম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মুন্‌শি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্ রে, তার ইংরেজি ভাষার কী জোর! সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয়। হাইকোর্টের জজের কাছে কোনদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয়নি।



কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠিখেলার কার্‌দানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্দুর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনো ছায়াটার পায়ে, কখনো তার ঘাড়ে, কখনো তার মাথায়। আর, মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চার দিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, শাবাশ্‌! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি।

এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি', তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুন্‌শিজীর জিত রইল। সবাই বলত 'শাবাশ্‌', আর মুন্‌শি মুখ টিপে হাসতেন।

অনুশীলনী

১। মুন্‌শিজী রবীন্দ্রনাথের দাদাকে ফার্‌সি পড়াতে এসে কি কি ব্যাপারে নিজেকে বেশি পারদর্শী বলে মনে করতেন ?

২। ‘কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি।’ রবীন্দ্রনাথ কথাটা কী অর্থে বলেছেন? মুন্‌শির চেহারার বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।

৩। ‘কিন্তু মুন্‌শির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপ-কর্মের বিশেষ সুবিধে হয়েছিল।’—লেখক এই কথাগুলো কোন্ ঘটনার সূত্র ধরে বলছেন?

৪। মুন্‌শিজীর লাঠিখেলার একটি বাস্তব বিবরণ দাও।

৫। রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি পড়ে তোমার কেমন লাগল তা অল্প কথায় লেখো।

৬। অর্থ লেখো ঃ

তালিম, গুমর, নজির, ফার্‌সি, মঞ্জুর, পৈতৃক, কার্‌দানি, শাবাশ্‌।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

খোশনাম, হাড়পাকা, পাপকর্ম, পড়াশুনা, লাঠিখেলা, দেশছাড়া, সুরেন্দ্রনাথ, মোমজামা।

৮। পদ পরিবর্তন করো ঃ

ক্ষমতা (বিশেষ্য)→বিশেষণ?
জিত (বিশেষ্য)→ক্রিয়া?
হতাশ (বিশেষণ)→বিশেষ্য?
বাঁচা (ক্রিয়া)→বিশেষ্য?

৯। বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

ক্ষমতা, শুরু, জিত, হাসতেন, দুঃখিত, পাওনা, লোকসান, নিজের, সামনে, পালোয়ান।

দেশোদ্ধার

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১৮৮৭-১৯৫৪)ঃ জন্ম—বর্ধমানের পাতিলপাড়া গ্রাম। পিতা দ্বারকানাথ। গদ্য-পদ্য লেখায় সমান দক্ষতা ছিল।



জুড়ে দে লাঙল ক'সে—
ফালের আগায় যত উঁচুনীচু সমভূম কর চ'ষে।
মাথা উঁচু ক'রে আছে ঢ্যালাগুলো,
মইয়ের চাপনে ক'রে দে রে ধুলো;
কাঁটার বংশ কর্ রে ধ্বংস জোএ জোএ বিদে ঘষে।

ফসল হবেই হবে!
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস যাকে,
টেনে তুলে লয়ে রু'য়ে দিবি পাঁকে;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার—
স'রে পড়ি যদি ক্ষমা ক'রো দাদা !
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে ক'রো ভাই মোরা চাষা নই — চাষার ব্যারিস্টার !

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারাংশ লেখো।

২। ব্যাখ্যা করো ঃ

মনে ক'রো ভাই মোরা চাষা নই — চাষার ব্যারিস্টার !

৩। কবিতাটির শিরোনামের তাৎপর্য বর্ণনা করো।

৪। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।

৫। বাক্য তৈরি করো ঃ

উঁচু নীচু, ঢ্যালা, কাঁটা, বর্ষা, দুর্যোগ, ক্ষমা।

শ্রীকান্ত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬-১৯৩৮) ঃ জন্ম—দেবানন্দপুর, হুগলী। পিতা মতিলাল। অর্থাভাবে কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। নানাদেশ ঘুরে, ব্রহ্মদেশে চাকুরি করেন। পরে বাংলায় উপন্যাস গল্প লিখে সমাজের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করেন। অনেকের ধারণা, 'শ্রীকান্ত' কাহিনী তাঁর নিজেরই জীবনকথা। সাধারণ মানুষের দুঃখবেদনার কাহিনী তাঁর গল্পকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছে।

আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা 'ছি-ছি' শুনিয়া শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ 'ছি-ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি'টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র-সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাস করিবার সুবিধাও দেন নাই; গাড়ি-পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে 'কাহিনী' নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না! বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী-লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এমনি অসঙ্গত, খাপছাড়া — এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতই এত বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা

করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে — সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ সকলও থাক। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না। ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সে-ই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না! সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি — পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না! আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক — একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারো মুখটুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু, কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না জানি না। কারণ বহু বৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়,

আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ্। সন্ধ্যা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ ওরে বাবা—এ কি রে! চটাচট্ শব্দ এবং মারো বেটাকে, ধরো বেটাকে! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে



কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ্ করিয়া ভাঙ্গিল এবং আরো গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে — পালাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল — সে-ই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে

কিছু বড়। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সত্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দুটি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কস্মিন-কালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ ঘেঁষিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, পালা।

ছুটিতে শুরু করিয়া কহিলাম, তুমি? সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, তুই পালা না—গাধা কোথাকার!

গাধাই হই — আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম — না।

অনুশীলনী

১। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্র তাঁর ভবঘুরে জীবন নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে তাঁর জীবনে সুদীর্ঘ 'ছি ছি'-র ভূমিকা সম্পর্কে কী সিদ্ধান্তে এলেন?

২। 'যাহার পা-দু'টা আছে সে-ই ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না।...' লেখকের এই মতের সঙ্গে যদি একমত হও তো কারণ দেখিয়ে লেখো।

৩। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখকের প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি নিজের ভাষায় জীবন্ত ক'রে লেখো।

৪। এই ছোট লেখাটি পড়ে ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি তোমার কেমন লেগেছে? তার চেহারার বিবরণ দাও।

৫। অর্থ লেখো ঃ

সুদীর্ঘ, চিহ্নিত, বিস্মৃত, লোক-লস্কর, সমভিব্যাহারে, অসঙ্গত, অজ্ঞাতসারে, অপযশ, বিড়ম্বিত, অন্তর্ধান।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

বহুকালান্তরে, বিদ্যুদ্‌গতিতে, মুষ্ট্যাঘাত, দুর্লভ।

৭। পদ পরিবর্তন করো ঃ

প্রকাশ (বিশেষ্য) → বিশেষণ ? দেওয়া (ক্রিয়া) → বিশেষ্য ?

দীর্ঘ (বিশেষণ) → বিশেষ্য ? পলায়ন (বিশেষ্য) → ক্রিয়া ?

৮। বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

মন্দ, মস্ত, বুড়া, ত্যাগ, সৃষ্টি, রুক্ষ, কালো, শক্ত, ছেলে।

এণ্টুনি ফিরিঙ্গির গান

এণ্ট্নি ফিরিঙ্গি ছিলেন পর্তুগীজ এবং খৃস্টান। সেকালের ক্ষমতাশালী কেলিসাহেবের ভাই ছিলেন তিনি। নিজ ধর্ম ত্যাগ করেননি বটে, তবে দোল-দুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন এবং দল বেঁধে কবিয়ালও হয়েছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁকে ভালো চোখে দেখেনি।

খৃস্টে আর কৃষ্টে কিছু
ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে,
এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে
হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ, শ্যামা দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানবজনম সফল হবে
যদি রাঙা চরণ পাই॥

আমি ভজনসাধন জানি না মা,
জেতেতে ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥

অনুশীলনী

১। এণ্ট্নি ফিরিঙ্গির এই গানটি রামবসু কবিয়ালের গালাগালির বিরুদ্ধে মুখে মুখে রচনা করেছিলেন। তাই মুক্তপ্রাণ, উদার ফিরিঙ্গি কবির কবিতাটি পড়ে তাঁর সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়?

২। 'খৃস্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই,......আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে'—ব্যাখ্যা করো।

৩। দুশো বছর আগের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে যে কবি বলতে পারেন— 'আমি ভজনসাধন জানি না মা জেতেতে ফিরিঙ্গি, যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী ॥'...তাঁর ধর্মজ্ঞান কী রকমের ছিল বলে মনে করো ?

৪। সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলো ঃ

খৃস্ট আর কৃষ্টে; শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে; খোদা যে হিন্দুর হরি সে; ভজনসাধন; শিবে মাতঙ্গী।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

ভজনসাধন, মানবজনম, রাঙাচরণ।

৬। নিচের বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের পদ পরিচয় লেখো ঃ

আমি ভজনসাধন জানি না, আমাকে দয়া ক'রে কৃপা করো, হে শিবে মাতঙ্গী।

কঙ্কাবতী

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৪৭-১৯১৯) ঃ জন্ম—রাহুতা, ২৪ পরগণা। পিতা বিশ্বম্ভর। সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক ছিলেন। ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। সরস.গল্প সাহিত্য লিখে জনপ্রিয় হন।

শহর অঞ্চলে নয়, বন্য প্রদেশে, কুসুমঘাটি বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি বড়, অনেক লোকের বাস, গ্রামের নিকটে মাঠ। সেকালে এই মাঠ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিত। সুবিধা পাইলে, নিকটস্থ গ্রামসমূহের দুষ্ট লোকেরা পথিকদিগকে মারিয়া ফেলিত ও তাহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু টাকা-কড়ি পাইত, তাহা লইত। মাঠের মাঝখানে যে সব পুষ্করিণী আছে, তাহার ভিতর হইতে আজ পর্যন্ত মড়ার মাথা বাহির হয়। মানুষ মারিয়া দুষ্ট লোকেরা এই পুকুরের ভিতর লুকাইয়া রাখিত।

মৃতদেহ গোপন করিবার আর একটি উপায় ছিল। পথিককে মারিয়া, মড়াটি লইয়া, দুষ্ট লোকেরা এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে ফেলিয়া



আসিত। অপর গ্রামে মড়াটি রাখিয়া, এক প্রকার 'কুঃ' শব্দ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত।

সে গ্রামের চৌকিদার সেই 'কুঃ' শব্দটি শুনিয়া বুঝিতে পারিত যে, তাহার সীমানায় মড়া পড়িয়াছে। চৌকিদার ভাবিত, 'যদি আমার সীমানায় মড়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে, কাল প্রাতঃকালে আমাকে লইয়া টানাটানি হইবে।'

এই কথা ভাবিয়া সেও আপনার বন্ধুবর্গের সহায়তায়, মৃতদেহটি অপর গ্রামে রাখিয়া সেইরূপ 'কুঃ' শব্দ করিয়া আসিত।

এইরূপে রাতারাতি মড়াটি দশ বার ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িত। কোথা হইতে লোকটি আসিতেছিল, কে তাহাকে মারিল, অতদূরে আর তাহার কোনও সন্ধান হইত না।

একে বন্য দেশ, তাহাতে আবার এইরূপ শত শত অপঘাত মৃত্যু। সে স্থানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি নানা গাছে নানা প্রকার ভূত আছে, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস। সন্ধ্যা হইলে, ঘরে বসিয়া, লোকে নানারূপ ভূতের গল্প করে, সেই গল্প শুনিয়া বালক-বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠে।

গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক-বালিকাদিগকে সাবধান করিয়া দেন, 'ডাইনীরা পথে "কুটা" হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৃণ যেন মাড়াইও না, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে।'

স্থলে, সেখানকার লোকের এইরূপ পদে পদে বিপদের ভয়, জলেও কম নয়। গ্রামের এক পার্শ্বে একটি নদী আছে। পাহাড় হইতে নামিয়া, 'কুল কুল' করিয়া নদীটি সাগরের দিকে বহিয়া যাইতেছে। হাঙ্গর, কুমীর নাই সত্য, কিন্তু নদীটি অন্য ভয়ে পরিপূর্ণ। শিকল হাতে 'জ'টে-বুড়ি' ত আছে-ই, তা ছাড়া নদীর ভিতর জীবন্ত পাথরও অনেক। সুবিধা পাইলে এই পাথর মনুষ্যের বুকে চাপিয়া বসে। নদীর ভিতরও এইরূপ নানা বিপদের ভয়।...

কুসুমঘাটির লোকের মনে এইরূপ নানা প্রকার বিশ্বাস। কিন্তু আজ কাল সকলের মন হইতে এই সব ভয় ক্রমে দূর হইতেছে। এখানকার অনেকে এখন তসরের গুটি ও গালা লইয়া কলিকাতায় আসেন। কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অংরাজীও পড়িয়াছেন। ভূত ডাইনীর কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ভূতের কথা পাড়িলে, তাঁহারা উপহাস করেন, 'পৃথিবীতে ভূত নাই, আর যদিও থাকে, তো আমাদের তাহারা কি করিতে পারে'—তাঁহাদের দেখা-দেখি আজকালের ছেলে-মেয়েদের প্রাণেও কিছু কিছু সাহসের সঞ্চার হইতেছে।

অনুশীলনী

১। 'শহর অঞ্চলে নয়, বন্যপ্রদেশে, কুসুমঘাটি বলিয়া একখানি গ্রাম আছে, গ্রামখানি বড়, অনেক লোকের বাস, গ্রামের নিকটে মাঠ। সেকালে এই মাঠ দিয়া লোক যাতায়াত করিত।' —এই অংশটিকে চলিত ভাষায় লেখো।

২। দুষ্টু লোকেরা মানুষ মেরে দু'ভাবে লুকোতো। উপায় দু'টি কী?

৩। 'কুঃ' শব্দতে চৌকিদার কেন ভয় পেতো?

৪। রাতারাতি কোনো একটি মড়াকে যদি দশ ক্রোশের মতো দূরে পাঠানো যেত, তাহলে সেকালে তার সন্ধান পাওয়ার অসুবিধা কী ছিল?

৫। অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি গাছে ভূত প্রেত থাকার গল্পের পেছনের কারণ কী?

৬। কুসুমঘাটিতে ইদানিং কুসংস্কার দূর হবার কারণ কী?

৭। অর্থ লেখো ঃ

নিকটস্থ, সমূহ, পুষ্করিণী, প্রাতঃকালে, অপঘাত, শিহরিয়া, অপ্রতুল, পিতামহী, মাতামহী, পরিপূর্ণ।

৮। পদ পরিবর্তন করো ঃ

গ্রাম (বিশেষ্য) → বিশেষণ? শিহরণ (বিশেষ্য) → ক্রিয়া?
মৃত (বিশেষণ) → বিশেষ্য? প্রাণ (বিশেষ্য) → বিশেষণ?

৯। সন্ধি-বিচ্ছেদ করো ঃ

সঞ্চার, পর্যন্ত, সংযত, নির্জন, নীরব।

শব্দসংহিতা

সুকুমার রায়

(১৮৮৭-১৯২৩) ঃ জন্ম—কলকাতা। পিতা শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ছোটদের জন্য নাটক, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন। চমৎকার ছবিও আঁকতেন, গান গাইতেন এবং অভিনয় করতেন। 'শব্দসংহিতা' কবিতাটি তাঁর লেখা 'শব্দকল্পদ্রুম' হাসির নাটকে আছে, কিন্তু এটিতে শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর দার্শনিক ইঙ্গিত রয়েছে।

শ্রীশ্রীগুরু প্রসাদগুণে তত্ত্বদৃষ্টি লভি
জগৎখানা ঠেকছে যেন শব্দে আঁকা ছবি
শব্দ পিছে শব্দ জুড়ি চক্রে গাঁথি মায়া
বাক্য ফিরে ছদ্মদেহে বিশ্ব তারি ছায়া



চক্রমুখে মন্ত্র ঠুকে বাঁধন কর ঢিলা
শব্দ দিয়ে শব্দ কাটো, এই ত শব্দলীলা,

যাঁহা স্বর্গ তাঁহা মর্ত তাঁহা পাতালপুরী
সত্য মিথ্যা একই মূর্তি খেলছে লুকোচুরি !
ভালো মন্দ বিষম ধন্দ কিছু না যায় বোঝা
সহজ কথায় মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে করে সোজা।
ভক্ত বলেন, 'আন্তিকালের সাদার নামই কালো
আঁধার ঘন জমাট হলে তারেই বলে আলো।'
শাস্ত্রে বলে, 'সৃষ্টি মূলে শব্দ ছিল আদি'
জগৎস্রোতে জড়ের বাঁধন শব্দে রাখে বাঁধি।
বস্তুতত্ত্ব বদ্ধ মায়া সত্ত্ব পরিহরি
শব্দ চক্রে ঘোরে বিশ্ব সূক্ষ্ম দেহ ধরি।
শব্দ ব্রহ্মা, শব্দ বিষ্ণু, শব্দ সরস্বতী।
বিশ্ব যজ্ঞ ধ্বংসশেষে শব্দে মাত্র গতি॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম লেখো।

২। ব্যাখ্যা করো ঃ

(ক) সৃষ্টি মূলে শব্দ ছিল আদি।

(খ) বাক্য ফিরে ছদ্মদেহে বিশ্ব তারি ছায়া।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

সূক্ষ্ম, ধ্বংস, আদি, সহজ, ঘন।

নকুড় মামা

রাজশেখর বসু

নকুড়-মামা পথের পার্শ্বস্থিত খদের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ওভারকোট, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিরক্তি। আমাকে দেখিয়া কহিলেন—'ব্রজেন নাকি ?'

বলিলাম—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তার পর, আপনি যে হঠাৎ দার্জিলিংএ ? বাড়ির সব ভাল তো ? কেষ্টর খবর কি—বেনারসেই আছে নাকি ? কি করছে সে আজকাল ?'—কেষ্ট নকুড়-মামার আপন ভাগিনেয়, বেনারসের বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সে একটু পাগলাটে লোক, নকুড়-মামাকে বড়-একটা গ্রাহ্য করে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে।



নকুড়-মামা কহিলেন—'সব বলছি। তুমি আগে আমার কথার জবাব দাও দিকি। এই দার্জিলিংএ লোকে আসে কি করতে হ্যা ? ঠাণ্ডা চাই ? কলকাতায় তো আজকাল টাকায় এক মণ বরফ মেলে,

তারই গোটাকতক টালির ওপর অয়েলক্লথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সস্তায় শীতভোগ হয়। উঁচু চাই—তা না হ'লে শৌখিন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, দু'বেলা তালগাছে চড়লেই তো হয়। যত সব হতভাগা—।'

এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল তখন বিশ্বকর্মা তাহাকে লইয়া একবার আচ্ছা করিয়া ময়দা-থাসা করিয়াছিলেন। তাঁর দশ আঙুলের গাঁট্টার ছাপ এখনও রহিয়া গিয়া স্থানে স্থানে পর্বত উপত্যকা নদী জলধি সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বকর্মার একটি বিরাট চিমটির ফল এই হিমালয় পর্বত। নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,—ভগবানের আশকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জিলিংএ বাসা বাঁধিয়াছে। নকুড়-মামা ধর্মভীরু লোক, অত বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।

আমি বলিলাম—'কি জানেন নকুড়-মামা, কষ্ট পাবার যে আনন্দ, তাই লোকে আজকাল পয়সা খরচ ক'রে কেনে। অমৃত বোস লিখেছে—

ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

দার্জিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ ক'রে পাহাড় ডিঙোবার বদখেয়াল হয়েছে। তবে এইটুকু আশার কথা—এখানে মাঝে মাঝে ধস নাবে।'

মামা ত্রস্ত হইয়া খদের কিনারা হইতে সরিয়া রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রান্তে আসিয়া বলিলেন—'উচ্ছন্ন যাবে। এটা কি ভদ্দর লোকের থাকবার দেশ? যখন-তখন বৃষ্টি, বাসা থেকে বেরুলে তো দশ তালার ধাক্কা, দু-পা হাঁটো আর দম নাও। তাও সিঁড়ি নেই, হোঁচট খেলে তো হাড়গোড় চূর্ণ। চললে হাঁপানি, থামলে কাঁপুনি—কেন রে বাপু?'

অনুশীলনী

১। "নকুড়-মামা পথের পার্শ্বস্থিত খদের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ওভারকোট, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিরক্তি! আমাকে দেখিয়া কহিলেন—'ব্রজেন নাকি ?'"—লেখকের শুরুর কয়েকটি ছত্র থেকে নকুড়-মামার চরিত্রটি কিভাবে ফুটে উঠেছে লেখো।

২। নকুড়-মামার ভাগ্নে কেষ্ট মানুষটি কেমন ?

৩। শহুরে লোকদের দার্জিলিং-এ ছুটি কাটাতে আসা সম্পর্কে নকুড়-মামা কী বলেন ?

৪। 'এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল—' বলে শুরু ক'রে লেখক বিশ্বকর্মার হিমালয় সৃষ্টি থেকে দার্জিলিং-এ মানুষের বাসা বাঁধা পর্যন্ত যে রসাত্মক বিবরণ দিয়েছেন তা নিজের মতো ক'রে লেখো।

৫। দার্জিলিং-এ মাঝে মাঝে ধস নামে শুনে নকুড়-মামা কী করলেন ?

৬। অর্থ লেখো ঃ

পার্শ্বস্থিত, কম্ফর্টার, ভ্রূকুটি, ভাগিনেয়, শৌখিন, বিশ্বকর্মা, জলধি, আশকারা, ধর্মভীরু, অপেক্ষাকৃত, নিরাপদ, উচ্ছন্ন।

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

উচ্ছন্ন, নিরাপদ, হিমালয়, ব্রজেন্দ্র।

৮। পদ পরিবর্তন করো ঃ

দেখিয়া (ক্রিয়া) → বিশেষ্য ? ————————

জবাব (বিশেষ্য) → বিশেষণ ? ————————

আপন (বিশেষণ) → সর্বনাম ? ————————

চলন (বিশেষ্য) → ক্রিয়া ? ————————

স্মরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিনের হারা আমি —চিহ্নবিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান,
হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিল আহ্বান-পাঁতি
যেখানে কালের সীমারেখা নেই—
খেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথি
গিয়েছিল দায়হীন সেখানেই।



দিই নাই, চাই নাই, রাখি নি কিছুই
ভালো মন্দের কোনো জঞ্জাল;
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার,
সে-আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা করো ঃ

‘ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।’

২। কবিতাটি মুখস্থ ক’রে আবৃত্তি করো।

৩। কবিতাটির সারাংশ লেখো।

৪। বাক্য রচনা করো ঃ

স্মরণ, চিহ্নবিহীন, সীমারেখা, ক্ষণকাল, ভাষাহারা।

৫। অর্থ লেখো ঃ

আহ্বান-পাঁতি, অবসান, ক্ষণকাল, ঋণভার, মর্ত্যকায়ায়, স্মরিতে।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

সীমারেখা, সভাঘর, ভাষাহারা, ঋণভার, শালবন।

৭। তিনটি ক’রে মিল দাও ঃ

অবসান, নাই, চিনেছ, ফাগুন, আহ্বান।

চড়ুইদের শত্রু

সুকুমার দে সরকার

(১৯০৯-১৯৭৮) : জন্ম—কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। হিসাব-পরীক্ষা বিশেষজ্ঞ। ছোটদের জন্য শিকারের কাহিনী লিখতেন। 'ভুবনেশ্বরী পদক' পুরস্কার পান।

সেদিনের প্রভাতটা গলানো রুপোর রং নিয়ে শুরু হয়েছে। রোদের সোনালী পরশমণি সবে লেগেছে আকাশে। প্রজাপতিরা ফুল ছেড়ে হালকা হাওয়ায় ভাসালো পাখা।

চড়ুইদের বাচ্চা দুটো ছট্ফট্ ক'রে উঠলো। ওই দূরান্তের নীল আকাশ, ওই দূরে বাঁকা নদীর ইসারা চোখ ঠেরেছে তাদের পাখায়। বুকে দুরু দুরু আশার কল্পনা।

চড়ুই-মা কর্তাকে বললো,— ওগো, দেখছো একবার কাকগুলোকে ?

কাকগুলো সেদিন যেন কোন্ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চড়ুই-কর্তা ঘুরে এসে বললো, নেই।

বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে এলো চড়ুই-মা।

ওই যে, পেয়ারার ডাল, আগে ওই পর্যন্ত। বাচ্চাদের বললো চড়ুই-মা।

দু-জোড়া ছোট ছোট নবীন ডানা প্রথম মুক্ত হলো আকাশে। পেয়ারার ডালের ওপর গিয়ে বসলো বাচ্চারা।

বাঃ বাঃ বেশ হয়েছে। এইবার ওই ধানের মরাই। সোজা আসবি আমার পিছনে। দল ছাড়বি না কেউ।

আগে চড়ুই-মা, পেছনে তার দুই বাচ্চা, আর তাদের পেছনে চড়ুই-কর্তা শূন্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তির্যক গতিতে ধানের মরাইটার দিকে বাঁক নিলো।

আকাশ নিস্তব্ধ — পৃথিবী স্থির। হঠাৎ সভয়ে মাথার ওপর চড়ুই-মা শুনলো গুণ্ডা-কাকটার ডাক — ক্বঃ-ক্বঃ-ক্বঃ-আ — !

কাকের দল ওৎ পেতে ছিল। ঝাঁপিয়ে তেড়ে এলো চড়ুই-বাচ্চাদের দিকে। নরম-নরম চড়ুই-বাচ্চার মাংস আজ কাকদের লাগবে ভালো। চড়ুই-মা চেঁচিয়ে উঠলো, বাসার দিকে, বাসার দিকে। দলটা বিদ্যুতের মতো বাঁক নিলো বাসার দিকে।

গুণ্ডা-কাকও কম ক্ষিপ্র নয়। সে তখন একটা বাচ্চার মাথার ওপর এসে পড়েছে। কাকটা ছোঁ মারলো; কিন্তু তার আগেই চিৎকার ক'রে চড়ুই-কর্তা প্রচণ্ড এক ঠোক্কর লাগালো কাকের মাথায়।

হাজার হোক চড়ুইয়ের ঠোক্কর, কাকের কী হবে ? কিন্তু তাক্‌টা ফস্কে গেল। চড়ুই-কর্তাকে ঝেড়ে ফেলে গুণ্ডা-কাকটা যমের মতো তেড়ে গেল বাচ্চাদের দিকে। বাচ্চাটা চেঁচিয়ে উঠলো,-চিঁ-চিঁ...... ।

গুণ্ডা-কাক ছোঁ মারবার সঙ্গে সঙ্গে কঁ্যা-কঁ্যা ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে চড়ুই-মা তার উদ্যত থাবার মধ্যে গিয়ে পড়লো। তাক্‌টা আবার ফস্কে গেল। গুণ্ডা-কাকটা ডানার এক ঝাপটায় চড়ুই-মাকে ছিটকে ফেলে, ঘুরেই দ্বিতীয় বাচ্চাটার পানে তেড়ে এক ডুব মারলো।



ভয়ই প্রাণী-জগতের সবচেয়ে প্রচণ্ড বিপদ। বাসাটা কাছে এসে গেছে। হয়তো বাচ্চাটা যদি ভয় না পেতো, তাহলে নিরাপদে বাসায় পৌঁছতে পারতো। কিন্তু বাচ্চাটা ভয় পেয়ে উল্‌টো মুখে বাঁক নিলো ঠিক গুণ্ডা-কাকটার দিকে।

সভয়ে সে দেখলো, তীক্ষ্ণ একটা ক্রূর লম্বা চঞ্চুর পেছনে এক জোড়া লাল চোখ, আর কালো দুটো বাঁকানো থাবা, বিদ্যুতের মতো তার দিকে এগিয়ে আসছে — আর তার পিছনে একটা সেই যমদূতের দল।

চিৎকার ক'রে উঠে চড়ুই-বাচ্চা চোখ বুজতে গেল। কিন্তু সে ক্ষমতাও তখন তার চলে গেছে।

আর নিমেষের ব্যবধান। বৈদ্যুতিক মুহূর্ত!

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। গুণ্ডা-কাকটা শূন্যে যেন লাফিয়ে উঠে ছিটকে পিছিয়ে গেল এক হাত! গলা দিয়ে তার একটিমাত্র শব্দ বেরোলো,— ক্ব!

তারপর একটা ভারী সীসের মতো ঝপ্‌ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল কাকটা। কাকের দল কা কা ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো।

খোকা চেঁচিয়ে উঠলো, মা মা, দেখে যাও একটা কাক শিকার করেছি। আনাড়ী খোকার হাতের গুল্‌তির টিপ্‌ আচমকা চড়ুই-বাচ্চার জীবন বাঁচিয়ে দিলো।

অনুশীলনী

১। চড়ুই পাখির বাচ্চারা কেন গুণ্ডা-কাকের শিকার হল? তাদের প্রথম ওড়ার বর্ণনা দাও।

২। গুণ্ডা-কাক দলবল নিয়ে কোথায় লুকিয়ে ছিল? হঠাৎ নিস্তব্ধ আকাশ থেকে কিভাবে ডেকে এগিয়ে এল সে আর তার দল?

৩। প্রথম আক্রমণ কে এবং কী ভাবে আটকাল চড়ুইদের পক্ষে? দ্বিতীয় আক্রমণই বা কীভাবে, কে আটকাল?

৪। 'ভয়ই প্রাণী-জগতের 'সবচেয়ে প্রচণ্ড বিপদ' — কথাটা কি সূত্রে বলা হয়েছে?

৫। চড়ুই-বাচ্চাকে যখন সে প্রায় ধরে ফেলেছে তখন গুণ্ডা-কাকের গলা থেকে 'ক্ক' শব্দ বেরিয়ে সে পড়ে গেল মাটিতে। তার কী হল বলে মনে করো?

৬। লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

কর্তা, মা, খোকা, মেম, ছাত্র।

৭। বহুবচন শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো ঃ

———————— ফুল ছেড়ে হাওয়ায় ভাসালো পাখা।

পেয়ারার ডালের ওপর গিয়ে বসল পাখির ————————।

চড়ুই-বাচ্চার মাংস ———————— ভালো লাগে।

ঝর্না

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৮৮২-১৯২২) ঃ কবিতার মধ্যে রকমারি সহজ সুন্দর ছন্দ তৈরি ক'রে তিনি প্রশংসা পেয়েছিলেন।

ঝর্না! ঝর্না! সুন্দরী ঝর্না!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দনবর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্না!



৭/৪

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কির হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধুলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে,
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা!
ঝর্ণা!

অনুশীলনী

১। কবিতাটি পড়ে যে দৃশ্য মনে জাগে, তা বর্ণনা করো।

২। ব্যাখ্যা করো ঃ

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।

৩। মানে লেখো ঃ

তরলিত চন্দ্রিকা, সিঞ্চিত, গৈরিক, গিরি-মল্লিকা, কুন্তলে, তাপসী অপর্ণা, উতরোল, বিহারিণী, লাস্যে, শ্রীমন্ত, ভর্ণা, ঊষর।

৪। বাক্য তৈরি করো ঃ

সিন্ধু, ধূসর, ভরসা, তৃষ্ণা, হরিণী।

বাংলার পুরনারী

দীনেশচন্দ্র সেন

(১৮৬৬-১৯৩৯) : জন্ম—কাজুরীগ্রাম, ঢাকা। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র। শিক্ষকতা করতেন এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে বাংলাভাষার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থটি লেখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

বাংলা যে এককালে জগতের অন্যতম সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল, তাহার প্রমাণ নানা গল্পের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। সোনার কলম, সোনার পালঙ্ক, সোনার ঝারির ত কথাই নাই, ধনীর গৃহে পরিবেশনের সময় সোনার থালা এবং সোনার বাটির ছড়াছড়ি হইত। ধনবান গৃহস্থের ঘরের মেয়েরা বহুসংখ্যক সহচরীর সঙ্গে নদীর ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন, তাহাদের কাহারও মাথায় স্বর্ণকুম্ভ, কাহারও মাথায় সোনার থালায় নীলাম্বরী, অগ্নিপাটের শাড়ী বা মেঘডুম্বর বস্ত্র, কাহারও হাতে নানারূপ গন্ধ তৈল ও প্রসাধনের দ্রব্য।



চাকলাদারের কন্যা কমলার স্নানের বর্ণনা, ও রাণী কমলার সোমেশ্বরী নদীতে শেষ স্নানের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি। চাকলাদারের মেয়ে তখন

নূতন বয়সী, সহচরীরা গান গাহিতে গাহিতে ও নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহাদের উল্লাসের কলকাকলী নদীর তীর মুখরিত করিতেছে। পাঁচ শত টাকার হাতীর দাঁতের শীতলপাটীর উল্লেখ অনেক গীতিকায়ই পাওয়া যায়।

চাকলাদারের কন্যা রাজসভায় তাঁহার বাল্যকালের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে এদেশের পল্লী-চিত্র একটি সোনা-বাঁধা ফ্রেমের ছবির মত ঝলমল করিয়া উড়িতেছে। বার মাস তের পার্ব্বণে পল্লীগুলি যেন সারা বৎসর নৃত্য করিতে থাকিত। সোনার বাটায় কেয়া খয়ের, চুয়া ও এলাচি দেওয়া পানের খিলি লইয়া তরুণীরা বাসর-গৃহে প্রবেশ করিতেন। গ্রীষ্মকালে নানারূপ আসবাবে সজ্জিত জলটুঙ্গী ঘর, দীঘির জলে অবস্থিত থাকিত। দীঘির জলের প্রস্ফুট পদ্মের সুরভি লইয়া বসন্তানিল মাঝে মাঝে সেই গৃহে ঢুকিয়া তাহা সুবাসিত করিয়া দিত। গজমতির মালা, হীরার হার, সোনার দাঁত খোঁচানী কাঠি প্রভৃতি অলঙ্কারপত্র ও বিলাসের সামগ্রী যে কত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

'লক্ষের শাড়ী' ত কথায় কথায় পাওয়া যায়। স্নানের সময় মেয়েরা গলার হীরার হার এবং সোনা ও জহরতের অলঙ্কার খুলিয়া রাখিতেন, পাছে তৈলসিক্ত দেহের স্পর্শে তাহারা মলিন হয়।

সাধারণরূপ ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে লড়াই করার জন্য আটটা দশটা ষাঁড় থাকিত—'লড়াই করিতে আছে আট গোটা ষাঁড়' (মেলুয়া গীতিকা) এবং প্রত্যেক গৃহস্থের ঘাটেই 'বাইচ' খেলিবার জন্য দীর্ঘ সুদর্শন ডিঙ্গি বাঁধা থাকিত।

এই সকল গীতিকায় ভৌগোলিক বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। রূপবতী গল্পে রাজা বাড়ী হইতে রওনা হইয়া ফুলেশ্বরী পাড়ি দিয়া নরসুন্দার মুখে পড়িলেন, এবং সেই নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঘোড়া-উৎরা ও পরে মেঘনায় আসিয়া পড়িলেন। এইভাবে কত নদ-নদী ও তীর্থস্থানের উল্লেখ পল্লীগীতিকায় পাওয়া যায়।

মোট কথা, তখনকার দিনে লোক দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাপান বা কামস্কট্কা দেখিত না, তাহারা স্বপ্নবিলাসী ছিল না। তাহাদের পল্লী ও গৃহ তাহাদের বড় আদরের সামগ্রী ছিল।

এখন আমরা দূরদেশ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ হইয়াছি, কিন্তু নিজগ্রামের নদীটির নাম পর্য্যন্ত জানি না। এই পল্লীগাথাগুলির কি হইল? প্রতিমা, মঠ, মসজিদ, মন্দির, নির্ম্মাণোপলক্ষ্যে সে চারুশিল্পকলার চর্চ্চা কোথায় গেল? এদেশে কি আর বসন্ত ঋতু আসে না, এদেশের কোকিল ও বউ-কথা-কও কি আর ডালে বসিয়া ডাকে না? কোথায় গেল সেই সকল সন্ধ্যামালতী ও কেয়া বনের সৌরভ?

বর্ষা আসে কিন্তু প্লাবন লইয়া বন্যা লইয়া তাহা কুটির ভাসাইয়া লইয়া যায়—সে বর্ষার কদম্ববর্ণ ও চাঁপার ঘটা ফুরাইয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

১। বাংলাদেশ এককালে যে জগতের অন্যতম সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল তা নিজের ভাষায় আট/দশ লাইনে লেখো।

২। পল্লীগাথায় চাকলাদারের কন্যার স্নানের কী বর্ণনা আছে?

৩। বার মাস তের পার্বণে পল্লীগুলো সারা বছর নাচছে বলে মনে হত কেন?

৪। 'ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে লড়াই করার জন্য আটটা, দশটা ষাঁড় থাকিত'—নিজের অভিজ্ঞতা বা কল্পনা থেকে একটি ষাঁড়ের লড়াইয়ের বর্ণনা দাও।

৫। 'মোট কথা, তখনকার দিনে লোক দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাপান বা কামস্কটকা দেখিত না, তাহারা স্বপ্নবিলাসী ছিল না। তাহাদের পল্লী ও গৃহ তাহাদের বড় আদরের সামগ্রী ছিল।'—ব্যাখ্যা করো।

৬। তুমি কি পল্লীগাথাগুলো সম্পর্কে কিছু জান? প্রতিমা, মঠ, মসজিদ আর মন্দির—এগুলো কি তা আলাদা আলাদা ভাবে লেখো।

৭। অর্থ লেখো ঃ

স্বর্ণকুম্ভ, নীলাম্বরী, কলকাকলী, মুখরিত, প্রস্ফুট, গজমতি, লক্ষের শাড়ী, জহরত, তৈলসিক্ত, 'বাইচ', ডিঙ্গি, প্রাজ্ঞ, কদম্ববর্ণ।

৮। সন্ধি-বিচ্ছেদ করো ঃ

নীলাম্বরী, উল্লাস, উল্লেখ, বসন্তানিল, অলঙ্কার, ফুলেশ্বরী।

জাগরণী

কাজী নজরুল ইসলাম

ভেদ-বিভেদের গ্লানির কারা-প্রাচীর
ধূলিসাৎ করি জাগো উন্নত শির
জবাকুসুম-সঙ্কাশ জাগো বীর,
বিধি-নিষেধের ভাঙ্গো ভাঙ্গো অর্গল।



ধর্ম-বর্ণ জাতির ঊর্ধ্বে জাগো রে নবীন প্রাণ
তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান
সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো
সকল মানুষে ঊর্ধ্বে ধরিয়া তোলো
তোমাদেরে চাহে আজ নিখিল জনসমাজ
আনো জ্ঞানদীপ এই তিমিরের মাঝ,
বিধাতার সম জাগো প্রেম প্রোজ্জ্বল।

অনুশীলনী

১। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রায় সব কবিতার মতো এই কবিতাটিতেও সবাইকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ছাড়িয়ে উঠতে বলছেন। এখানে 'বিধি-নিষেধের ভাঙ্গো ভাঙ্গো অর্গল' বলতে তাই তিনি কী বলতে চাইছেন ?

২। কবিতাটি মুখস্থ করো।

৩। ব্যাখ্যা করো ঃ

তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান।

৪। মানে লেখো ঃ

ভেদ-বিভেদ, কারা-প্রাচীর, ধূলিসাৎ, জবাকুসুম-সঙ্কাশ, অভ্যুদয়ে, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, ঊর্ধ্বে, প্রোজ্জ্বল, তিমিরের মাঝ।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

জবাকুসুম, জনসমাজ, জ্ঞানদীপ, কারাপ্রাচীর।

উপনিষদ্

বিধুশেখর ভট্টাচার্য

(১৮৭৮-১৯৫৯) ঃ জন্ম—হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ। কাশীতে ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে বেদকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কিন্তু এই দুই নামে কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই। বৈদিক যে কোনো গ্রন্থে বা তাহার অংশবিশেষে কর্ম ও জ্ঞানের আলোচনা আছে, তাহাকেই যথাক্রমে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়।

কী উপায়ে পরম কল্যাণ হইতে পারে ইহা অপেক্ষা আর কোনো গুরুতর প্রশ্ন মানবের নাই, এবং ইহার সমাধানের চেষ্টা সে বরাবর করিয়া আসিয়াছে, করিতেছে এবং পরেও করিবে।

ভারতে এ বিষয়ে কী চিন্তা হইয়াছে তাহা আমরা প্রথমে বেদে দেখিতে পাই। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋষিগণ মনে করিতেছেন যে, যাগ-যজ্ঞ কর্মের অনুষ্ঠানে ঐ কল্যাণ লাভ করা যায়। তাঁহারা সোমযাগ করিতেন, আর মনে করিতেন আমরা অমর হইয়াছি। তাঁহারা এইরূপ বহু যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। ক্রমে তাঁহাদের চিন্তার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়। কিছু-না-কিছু কামনা করিয়াই তাঁহারা যাগ-যজ্ঞ করিতেন।

কিন্তু তাঁহাদের কেহ কেহ দেখিলেন, উহাতে উত্তরোত্তর কামনার বৃদ্ধি হয় বৈ হ্রাস হয় না, এবং এইজন্য তাহাতে দুঃখেরও অবসান হয় না, শান্তিও আসে না।

কেহ-কেহ ভাবিলেন, কৃষিকর্মের ফল যেমন অস্থায়ী, বেদোক্ত কর্মেরও ফল তেমন অস্থায়ী।

কেহ-কেহ মনে করিতেন, ভেলায় যেমন সমুদ্রের পারে যাওয়া যায় না, তেমন কর্মের দ্বারা সংসারের দুঃখ অতিক্রম করিতে পারা যায় না।

এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, বেদোক্ত কর্মের দ্বারা মানবের শেষ প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না। আবার অনেক বৈদিক কর্মে পশুহিংসা থাকায় অনেকেরই তাহা ভালো লাগিল না। তাঁহারা তাহা কিছুতেই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

এইরূপ মনে করিয়া কেহ-কেহ মানবের কল্যাণ অন্য প্রকারে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহারা ভাবিলেন, ইহা জ্ঞানেরই দ্বারা হইতে পারে, কর্মের দ্বারা নহে। এই জ্ঞানবাদীদেরই উক্তি স্থান পাইয়াছে জ্ঞানকাণ্ডে। আমাদের উপনিষদ্ এই জ্ঞানকাণ্ডেরই অন্তর্গত।

আরো একপ্রকারে বেদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যে ভাগে যজ্ঞ প্রভৃতি কার্যে প্রযোজ্য কেবল মন্ত্রগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা মন্ত্র। ইহারই অপর নাম সংহিতা। যেমন, ঋগ্বেদ-সংহিতা বা ঋক্ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা বা যজুঃ সংহিতা, ইত্যাদি।

আর যে ভাগে যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ ও মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম ব্রাহ্মণ। এক হিসাবে ইহাকে বেদের আদিম ব্যাখ্যা বা বিবরণ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম(ন্) শব্দের মানে এখানে বেদ। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ইহা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আলোচনা আছে।

ইহার যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সাঙ্কেতিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, তাহাকে আরণ্যক বলা হয়, কেন না ইহা অরণ্যে অর্থাৎ বনে পাঠ করা হইত, কারণ, এইসব কথা দুরূহ বলিয়া যেখানে সেখানে যাহাকে-তাহাকে শেখান হইত না, এবং ইহা অবধারণ করিবার

জন্য অতি নির্জন স্থান আবশ্যক হইত। আমাদের বহু উপনিষদ্ এই আরণ্যকের অন্তর্গত, কেবল একখানি মাত্র উপনিষদ্ মন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে। ইহার নাম ঈশোপনিষদ্। ইহা হইতেছে শুক্ল যজুর্বেদের শেষ (অর্থাৎ ৪০শ) অধ্যায়।

অনুশীলনী

১। বেদকে মোট ক'টি ভাগে ভাগ করা যায়? ভাগ ক'টি লেখক কিসের ভিত্তিতে করেছেন?

২। মানুষের জীবনে সব চাইতে গুরুতর প্রশ্ন কী যা এখানে বলা হয়েছে?

৩। 'ভারতে এ বিষয়ে কী চিন্তা হইয়াছে তাহা আমরা প্রথমে বেদে দেখিতে পাই। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় ঋষিগণ মনে করিতেছেন যে, যাগ-যজ্ঞ কর্মের অনুষ্ঠানে ঐ কল্যাণ লাভ করা যায়। তাঁহারা সোমযাগ করিতেন, আর মনে করিতেন আমরা অমর হইয়াছি।' অংশটি চলিত ভাষায় লেখো।

৪। ব্যাখ্যা করো:

আমাদের বহু উপনিষদ্ এই আরণ্যকের অন্তর্গত, কেবল একখানি মাত্র উপনিষদ্ মন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে।'

৫। অর্থ লেখো:

প্রতিপাদ্য, যাগ-যজ্ঞ, ব্যাপৃত, উত্তরোত্তর, কামনা, বেদোক্ত, অস্থায়ী, অতিক্রম, পশুহিংসা, সিদ্ধি, জ্ঞানবাদী, সাঙ্কেতিক, আধ্যাত্মিক, আরণ্যক, উপনিষদ্।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ করো:

উত্তরোত্তর, অন্তর্গত, বেদোক্ত, ঋগ্বেদ, নির্জন, ঈশোপনিষদ, যজুর্বেদ।

৭। প্রত্যেকটি শব্দের কারক ও পদ নির্ণয় করো:

ভারতে এ বিষয়ে কী চিন্তা হইয়াছে তাহা আমরা প্রথমে বেদে দেখিতে পাই।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো:

যাগযজ্ঞ, অস্থায়ী, বিশুদ্ধ, কৃষিকর্ম, পশুহিংসা।

হাজার বছর পর

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(১৯০৪-   ) ঃ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রূপে বহু দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদনার অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর 'শতাব্দীর সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। অনেক প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা।

হাজার বছর পর
বায়ুভূত নিরাশ্রয় দেখা দিবে নতুন মানুষ ?
জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই, নাইকো হতাশা,
জয়-পরাজয় কিম্বা প্রিয়জন আর ভালোবাসা
কিছু নাই,—আছে শুধু মঙ্গলে শনিতে চন্দ্রে
উদাসীন অনন্ত সময়, গতিহীন জীবলোক
নিরানন্দ আনন্দের ব্যথাহীন জীবন বেদনা !



তার পর কবে একদিন হাজার বছর পর
চন্দ্রলোকে সভা হবে, মঙ্গলেতে জনতার ভীড়
মহাকাশে হট্টগোল, বিজ্ঞানীরে বলিবে হাঁকিয়া
'ফিরে দাও, ফিরে দাও মোদের সে হারানো পৃথিবী !'

হাজার বছর পর
কে জানে কোথায় হবে মানুষের ঘর ?

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা করো ঃ

আছে শুধু মঙ্গলে শনিতে চন্দ্রে
উদাসীন অনন্ত সময়, গতিহীন জীবলোক
নিরানন্দ আনন্দের ব্যথাহীন জীবন বেদনা !

২। কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় লেখো।

৩। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।

৪। 'ফিরে দাও, ফিরে দাও মোদের সে হারানো পৃথিবী !'—এই উক্তির তাৎপর্য বর্ণনা করো।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

নতুন, উদাসীন, ভীড়, ভালোবাসা, দাও।

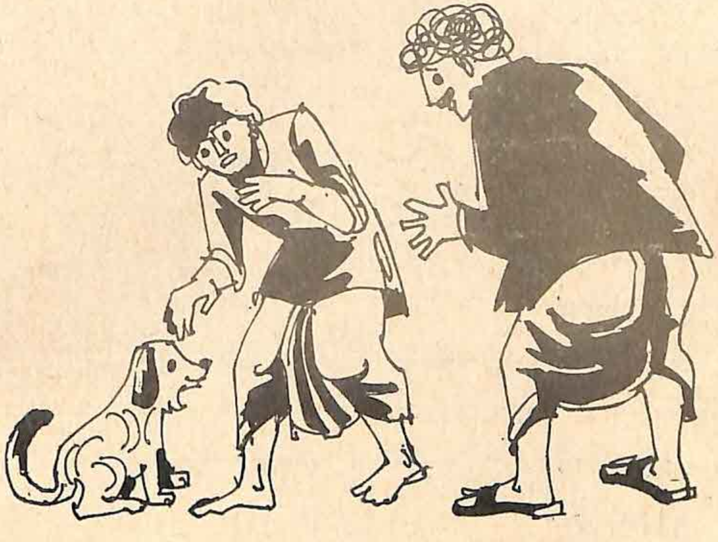
বুলডগ্

শিবরাম চক্রবর্তী

(১৯০৩-১৯৮০) ঃ জন্ম—চাচেল, মালদহ। পিতা শিবপ্রসাদ। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তিনি প্রথম 'যুগান্তর' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট 'হর্ষবর্ধন' ও 'গোবর্ধন' চরিত্র দুটি খুবই জনপ্রিয়।

শেষটা গোবর্ধনের বুলডগ্‌টাকেই আলমবাজারের পশুপক্ষীর পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দেওয়া হলো। রীতিমতন আবাসিক বিদ্যালয়। পশুপক্ষীরা হোসটেলে থাকে, ইস্কুলে পড়ে। গরমের আর পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসে। সব ইস্কুলের যেমন রেওয়াজ।

গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরলো বুলডগ্। দুই ভাই তাকে নিয়ে পড়লেন — কদ্দুর শিখেছে দেখা যাক্।



'বিজাতীয় ভাষা ? তাও কিছু শিখিসনি ? ইংরিজি, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন....?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু ।

'ম্যাও ।' কুকুরটা মুখ খোলে এবার ।....

'হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেয়েছে দেখছি ।' তোতাপাখিটা দাঁড়ে বসে পাকামি করে, ফোড়ন কাটে ।

'মিউ ।' করুণ সুরে কুকুরটা সাড়া দেয় ।

অনুশীলনী

১। হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন শিবরাম চক্রবর্তীর দু'টি প্রিয় চরিত্র । 'বুলডগ্' গল্পে এদের কুকুরের সঙ্গে সংলাপ থেকে তোমার এই দুই ভাই সম্পর্কে যে ধারণা হচ্ছে তা সংক্ষেপে দশ লাইনের মধ্যে লেখো ।

২। পশুপক্ষীর আবাসিক বিদ্যালয় হলে সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে তোমার ধারণা বর্ণনা করো ।

৩। যখন তোতাপাখিটা 'হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেয়েছে' বলে দাঁড়ে বসে পাকামি ক'রে ফোড়ন কাটে, তখন বুলডগ্‌টা বেড়ালের কচি বাচ্চার মত 'মিউ' ক'রে ওঠে কেন বল তো ?

৪। তোমার নিজের ভাষায় ছোট ক'রে 'বুলডগ্' গল্পটি লেখো ।

৫। বুলডগ্ কুকুর সম্পর্কে কিছু জান কী ? না জানলে জেনে নিয়ে লেখো ।

৬। শিবরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে যা জান লেখো ।

৭। কাল নির্ণয় করো ঃ

(ক) পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দেওয়া হলো ।

(খ) কুকুরটা লেজ নাড়ে কেবল ।

(গ) লেজের ড্রিলটাই শিখেছে দেখছি ।

(ঘ) ক্রমে ক্রমে শিখবে সব ।

(ঙ) তোতাপাখিটা ফোড়ন কাটে ।

'অঙ্ক পারিস—অঙ্ক ? দুই আর দুয়ে কত হয় ?'

'ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।' কুকুরটা পা ঠুকে জানালো — চার।

'বাঃ অঙ্কটা তো বেশ শিখেছে দেখছি। নামতা জানিস, নামতা ? ষোলো ষোলং কতো হয় বলতে পারিস ?' গোবর্ধন শুধোয়।

কুকুরটা আর পা নাড়ে না, চুপ ক'রে থাকে।

'একেবারে ষোলো ষোলং !' হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন : 'কেউ তা পারে ? তুই পারিস বলতে—ষোলো ষোলং ? আমি পারি ? কেউ পারে ? যে ও পারবে ?'

'আচ্ছা থাক্। জিমন্যাস্টিক্ শিখেছিস ? ড্রিল ? প্যারেড ? লেফট...রাইট...লেফট...রাইট...।'

কুকুরটা লেজ নাড়ে কেবল।

'ওই তো শিখেছে। লেজের ড্রিলটাই শিখেছে দেখছি। ডাইনে বাঁয়ে নাড়ছে। ক্রমে ক্রমে শিখবে সব। ক'দিন আর পড়েছে বল।'

'সমস্কৃত শিখেচিস ?' গোবর্ধন শুধায়।

কুকুর চুপ।

'হ্যাঁ কি না বল্। শিখেছিস সমস্কৃত ?'

কুকুর নিরুত্তর।

'ওমা ! মাঝখান থেকে এ যে দেখছি তামিলটাও ভুলে গেল আবার ?'

'কিসের তামিল ?' জানতে চান দাদা।

'হুকুম তামিল।' বললো গোবর্ধন : 'কথার কোনো জবাবই দিচ্ছে না দেখছো।'

'কী ক'রে শিখবে সমস্কৃত ? কুকুরেরা কি অনুস্বর উচ্চারণ করতে পারে ? অং বং বলতে পারবে কুকুর ? তোর যত বাড়াবাড়ি।'

'তাহলে জাতীয় ভাষা ? হিন্দী ?' গোবরার জিজ্ঞাসা।

কুকুরটা চুপ।

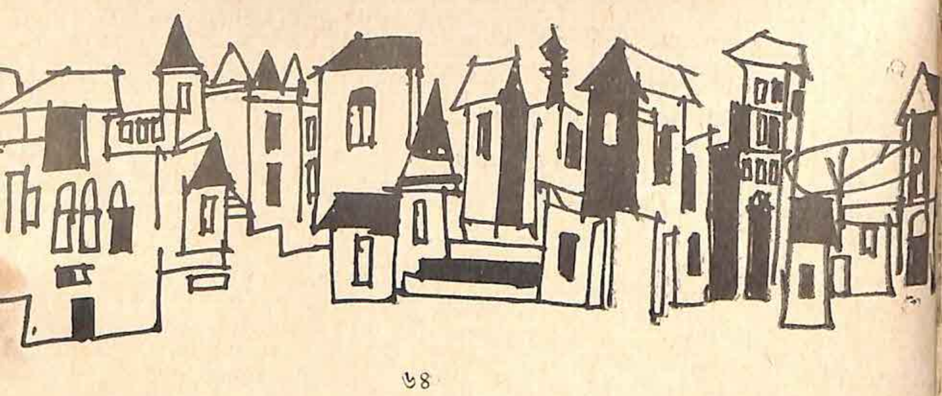
পৃথিবীলোক

জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪) : জন্ম—বরিশাল। পিতা সত্যানন্দ। ইংরেজিতে এম্ এ পাস ক'রে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;
গ্রামপতনের শব্দ হয়;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু ভয়,
বিহ্বলতা ব'লে মনে হয়।

এ-সব শূন্যতা ছাড়া কোনোদিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে



তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা করো ঃ

'তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী'

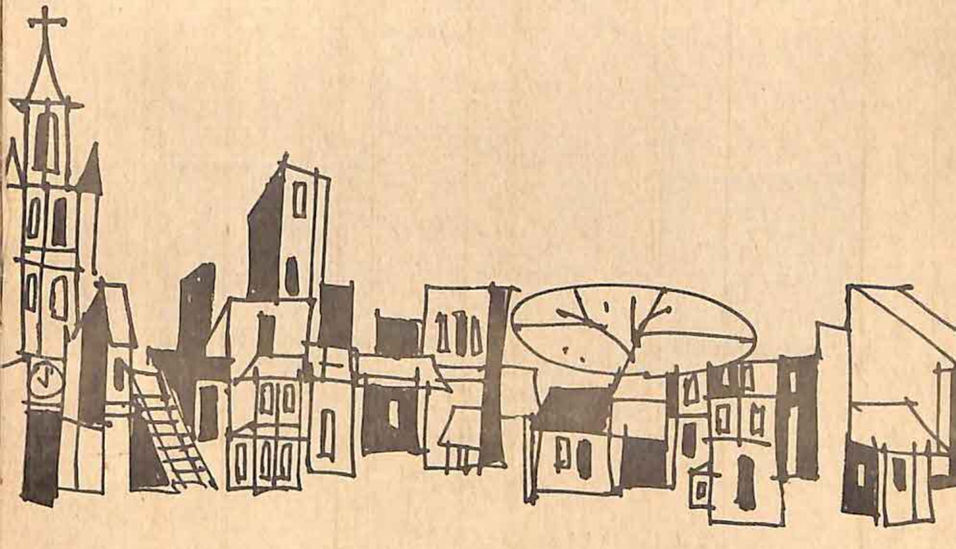
২। কবিতাটির সারাংশ লেখো।

৩। বাক্য তৈরি করো ঃ ভাঙে, ক্ষতি, তীরে. চিন্তা, জ্ঞান।

৪। অর্থ লেখো ঃ বিহ্বলতা, শূন্যতা, ব্যর্থ, গ্লানি, বিচিত্র।

৫। কবিতাটি মুখস্থ করো এবং অর্থ ও ছন্দ বুঝে আবৃত্তি করো।

৬। বিশেষণ পদে পরিবর্তন করো ঃ মৃত্যু, পৃথিবী, ভয়. শূন্যতা, বিহ্বলতা।



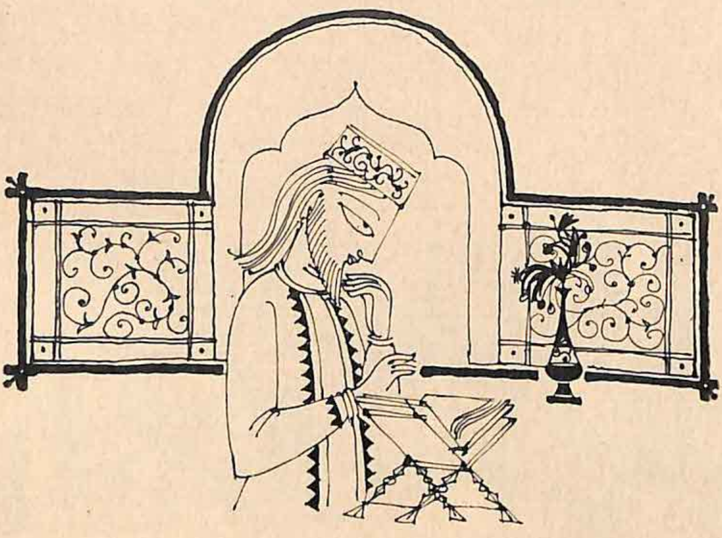
"বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?"

সৈয়দ মুজতবা আলী

(১৯০৪-১৯৭৪): নানা দেশ বেড়িয়েছেন, বিদেশে পড়াশুনা ক'রে প্রশংসা পেয়েছেন, অনেকগুলি ভাষা জানতেন। ভ্রমণ কাহিনী, গল্প সুন্দর লিখতেন।

আরব ও ইরানের (পারশ্যের) মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে যে, এ দু'দেশের মাঝখানে কোনো তৃতীয় দেশ নেই। অর্থাৎ আরবদেশের পূর্ব সীমান্তে আরবী ভাষা এসে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই ফার্সী ভাষা আরম্ভ হয়েছে।

সকলেই জানে, খলিফা আবু বকরের আমলে মুসলিম আরবের অমুসলিম ইরান দখল করে। ফলে সমস্ত ইরানের লোক আগুন-



পূজা ছেড়ে দিয়ে মুসলিম হয়। মুসলিম শিক্ষাদীক্ষা, মুসলিম রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রভূমি তখন মদীনা। কেন্দ্রের ভাষা আরবী এবং সে ভাষাতে কুরান নাজিল অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়েছেন, হজরতের বাণী হদীসরূপে সেই ভাষায়ই পরিস্ফুট হয়েছে। কাজেই আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করার বাসনায় ইরানে আরবী ভাষা প্রবর্তিত করার ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছিল।

আমরা জানি, বহু ইরানবাসী ইসলাম গ্রহণ ক'রে, আরবী শিখে, মুসলিম জগতে নাম রেখে গিয়েছেন। আরো জানি, পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আব্বাসীদের আমলে রাষ্ট্রকেন্দ্র ইরানের আরো কাছে চলে এসেছিল। ইরাকের বাগদাদ ইরানের অত্যন্ত কাছে ও আব্বাসী যুগে বহু ইরানী বাগদাদে বসবাস ক'রে উচ্চাঙ্গের আরবী শিখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমস্ত ইরানদেশ তখন আরব গবর্নর, রাজকর্মচারী, ব্যবসাদার, পাইকবরকন্দাজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ইরানের সর্বত্র তখন আরবী মক্তব-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি, আরবী শিক্ষিত মৌলবী-মৌলানায় ইরান তখন গম্‌গম্ করত।

তবে কেন তিনশত বৎসর যেতে না যেতে ফার্সীভাষা মাথা খাড়া ক'রে উঠল? দশম শতাব্দীর শেষভাগে দেখতে পাই, ফার্সীভাষার নবজাগরণের চাঞ্চল্য সমস্ত ইরানভূমিকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে। গল্প শুনি, ফিরদৌসীকে নাকি ফরমাইশ দেওয়া হয়েছিল ইরানের প্রাক্-মুসলিম সভ্যতার প্রশস্তি গেয়ে যেন কাব্য রচনা করা হয়, এবং ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (মূহিম্) ফরমাইশ, সে-কাব্য যেন দেশজ ফার্সীকথায় রচিত হয়, তাতে যেন আরবী শব্দ বিলকুল ঢুকতে না পারে।

গল্পটি কতদূর সত্য বলা কঠিন। কারণ ফিরদৌসীর মহাকাব্যে অনেক আরবী কথা আছে কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবী ভাষা যে কোনো কারণেই হোক দেশের আপামর জনসাধারণকে তৃপ্ত করতে পারে নি বলেই ফার্সীর অভ্যুত্থান হল।

অনুশীলনী

১। ইরানের অমুসলিম লোকেরা আগুন পূজা ছেড়ে দিয়েছিল কেন ?

২। ব্যাখ্যা করো ঃ

কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করবার বাসনায় ইরানে আরবী ভাষা প্রবর্তিত করার ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছিল।

৩। অর্থ লেখো ঃ

হজরতের বাণী, মাদ্রাসা, ফার্সী, আব্বাসী, মৌলবী, বিলকুল।

৪। ফিরদৌসীকে কী ফরমাইশ দেওয়া হয়েছিল বলে গল্প প্রচলিত আছে ?

৫। ফার্সীভাষার অভ্যুত্থান হয়েছিল কেন ?

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

অমুসলিম, শিক্ষাদীক্ষা, রাষ্ট্রকেন্দ্র, রাজকর্মচারী, আরবীশিক্ষিত, মহাকাব্য।

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

সীমান্ত, অভ্যুত্থান, পরিস্ফুট, অত্যন্ত, শতাব্দী, ততোধিক।

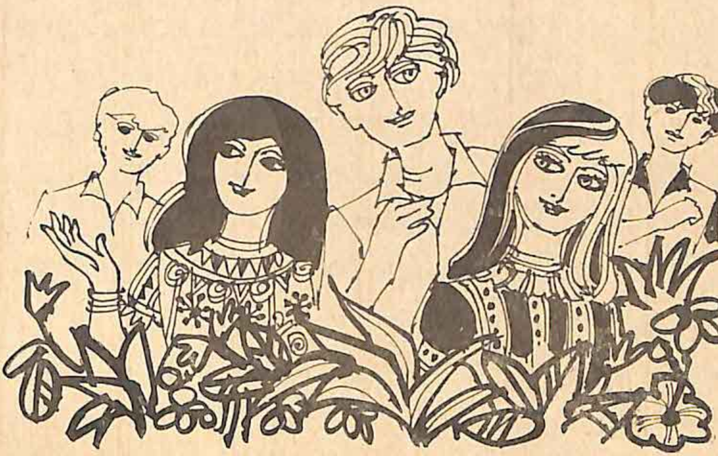
৮। পদ পরিবর্তন করো ঃ

প্রবর্তিত, অবতীর্ণ, সমর্থ, চাঞ্চল্য, আরবী।

কিশোর

গোলাম মোস্তাফা

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে।



সাগর জলে পাল তুলে দে' কেউ বা হবো নিরুদ্দেশ
কলম্বসের মতই বা কেউ পৌঁছে যাবো নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময় এই বাঙালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান গরিমা শক্তি সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।
আকাশ-আলোর আমরা সুত, নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কী যে করবো মোরা — নাইকো তাহার অন্ত রে।

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা করো :

ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে।

২। কবিতাটি মুখস্থ করো। প্রথম চার লাইন না দেখে লেখো।

৩। ভাব সম্প্রসারণ করো :

কতই কী যে করবো মোরা—নাইকো তাহার অন্ত রে!

৪। তিনটি ক'রে প্রতিশব্দ লেখো :

নূতন, সাগর, বিশ্ব, শিশু, পিতা, সুত, অন্ত, জল।

৫। মিল দাও :

আকাশ, লক্ষ, মন্তর, মাঝে, আশা, বাণী, অগ্রদূত, রাঙা।

বাংলা সাহিত্যের কথা

নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী

(১৮৯৩-১৯৭২)ঃ পিতা রাধিকানাথ। বৃন্দাবন, বারাণসী ও কলকাতার সংস্কৃত কলেজে এবং শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। নানা গ্রন্থ প্রণেতা।

বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে-যুগ, তাকে আধুনিক যুগ ব'লে ধরা গেল। এই যুগেই বাংলা সাহিত্যের চরম উন্নতির কাল। ভারতচন্দ্র রায় আর রামপ্রসাদ সেই যুগের আদিতে বর্তমান।

পোর্টুগীজ ও ইংরেজ মিশনারিরা এসে তাঁদের ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তখন ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান হল, তার ফলে এদেশে খ্রীস্টানধর্মের প্রসার গেল কমে, মিশনারিদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে প্রতিবাদ-গুলি সব গদ্যেই লেখা হত। রাজা রামমোহন ছিলেন এর অগ্রণী। তিনি বেদ উপনিষদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র থেকে যুক্তি সংগ্রহ ক'রে লিখতে লাগলেন বাংলায়। এই সময়ে দু-একখানা সংবাদপত্রও বেরুতে লাগল। তা অবশ্য পদ্যেই লিখতে হত।

এমনি ক'রে কিছুকালের মধ্যে বেশ খানিকটা গদ্য বাংলাতে জমে উঠল। রামমোহনের আগেকার সাহিত্যিক গদ্য কিম্ভূতকিমাকার ছিল। এই সময় বাংলাদেশে যে সব ইংরেজরা আসেন, তাঁরাও বাংলা শিখে বইপত্র লিখতে আরম্ভ করেন। কতগুলি গদ্যের নমুনা দেওয়া গেল।

কেরি সাহেবের লেখা গদ্য ঃ

'আঃ মহাশয় এই যে খবর করিয়াছে তাহাকে কি বলিব উহারে তো দিয়াছে আর উহার সঙ্গে দশ বার জনকে বিদায় এক এক জনকে দশ বার টাকা করিয়া দিয়াছে, আর উহাকে কতই সয়।'

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্য :

'দূরবর্ত্তী হট্টগামী লোকদের শ্রবণ-বিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনিমাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ গমনোত্তর সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকট বশতঃ খণ্ডশঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসনভূষণকদলী-মূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়, হট্টনিকটপ্রাপ্ত্যুত্তর ক্রয়বিক্রয়কারী পুরুষদের বাক্যশ্রুতি হয়।'

তবে মৃত্যুঞ্জয় চলিত ভাষায় সরল গদ্যও লিখে গেছেন।

মার্শম্যান সাহেবের গদ্য :

'ইহাতে একটা দাঙ্গা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ঐ ফৌজদারের পিতা এক তলোয়ারের দ্বারা মস্তকাঘাতী হইলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধীর উদরেও ঐ উকীল স্বয়ং এক পিস্তলের দ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিয়া আঘাতী করিলেন।'

তখনকার সংবাদগুলির ভাষাও এইরকম ছিল। এই গদ্য পড়ার সময় অর্থের গোলমাল হতে পারে, সেজন্য রাজা রামমোহন গদ্য পড়ার যে নিয়ম করেছিলেন, তার খানিকটা এই — 'যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া না পাইবেন।'

অনুশীলনী

১। বাংলা সাহিত্যের চরম উন্নতির কাল কাকে বলে?

২। কিভাবে এবং কাদের উদ্যোগে বাংলা গদ্য রচনার বিকাশ ঘটেছিল, বর্ণনা করো।

৩। অর্থ লেখো :

অভ্যুত্থান, কিম্ভূতকিমাকার, হট্টগামী, হট্টাগত, গমনোত্তর, সমনস্ক, শ্রবণেন্দ্রিয়, খণ্ডশঃ, তদুত্তর, হট্টনিকটপ্রাপ্ত্যুত্তর।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

হট্টাগত, গমনোত্তর, শ্রবণেন্দ্রিয়, তদুত্তর, বিদ্যালংকার।

৫। আধুনিক চলিত ভাষায় লেখো ঃ

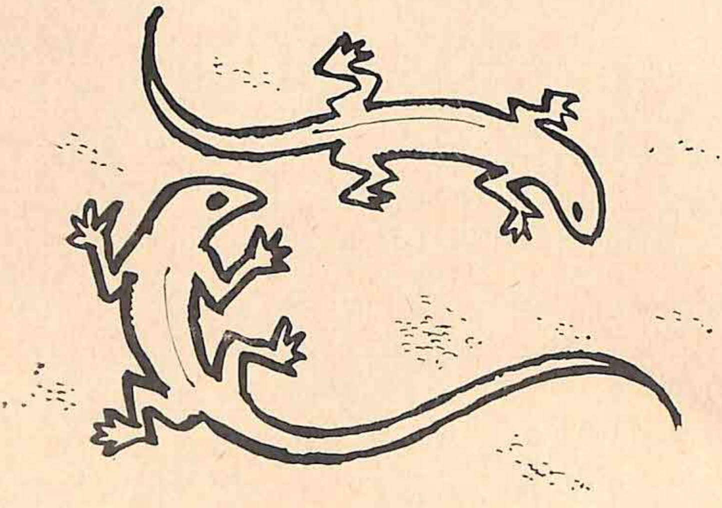
বাক্যশ্রুতি হয়? দাঙ্গা উপস্থিত হয়; অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন; পিস্তলের দ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিয়া আঘাতী করিলেন।

কুলীন কাহিনী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৯২০-১৯৮৫) ঃ জন্ম—বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা হরেন্দ্রনাথ, মাতা সুরবালা। বহু কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশিত।

টিকটিকিকে বলেন গিরগিটি ঃ
ঐ যে দেখেন, ঐটি আমার বিটি।
কুলীন একটি পাত্র যদি পাই
ঠিক করেছি, রাখব ঘর-জামাই।



গিরগিটিকে বলেন টিকটিকি ঃ
কুলীন একটি পাত্র আছে ঠিকই,
ঘর-জামাইয়ে আপত্তি তার নাই ;
দশটি হাজার নগদ কিন্তু চাই।

টিকটিকিকে বলেন গিরগিটি ঃ
যা বলেছেন, ন্যায্য কথা সিটি,
কিন্তু গবর্নমেণ্টকে বড় ভয় ;
আইন করেছে একটি পয়সা নয়।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।

২। গিরগিটি আর টিকটিকির মধ্যে আলোচনার বিষয়টি সংক্ষেপে লেখো।

৩। অর্থ লেখো ঃ
বিটি, সিটি, কুলীন, ন্যায্য

৪। 'আইন করেছে একটি পয়সা নয়'—তাৎপর্য লেখো।

৫। কোন্‌টি কর্তৃকারক নির্ণয় করো ঃ
(ক) ঐটিআমার বিটি।
(খ) একটি পাত্র যদি পাই।
(গ) গবর্নমেণ্টকে বড় ভয়।
(ঘ) কুলীন একটি আছে ঠিকই।
(ঙ) টিকটিকিকে বলেন গিরগিটি।

ঢোক্‌রা কামার

কমলকুমার মজুমদার

(১৯১৫-১৯৭৯) : জন্ম—টাকী, ২৪ পরগণা। পিতা প্রফুল্লকুমার। শিল্পী ও সাহিত্যিক। গদ্যরচনায় বিশেষ ভঙ্গী ব্যবহার করতেন। ছোটদের জন্য ছবিসহ ছড়া লিখেছেন। তাঁর লেখা বই 'আইকম বাইকম', 'পানকৌড়ি' ইত্যাদি।

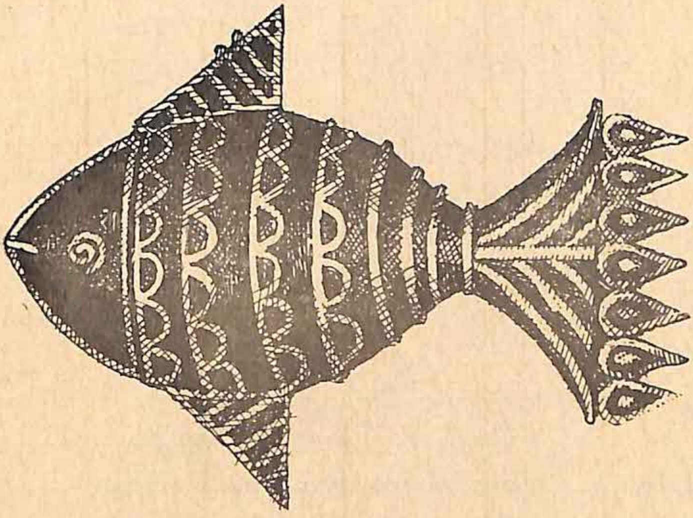
বাংলার জাতিতত্ত্বে উল্লিখিত অষ্ট কামারের মধ্যে এক কামার 'ঢোক্‌রা'। এ ছাড়া সেক্‌রা, চাঁদ-কামার, লৌহ-কামার ও অন্যান্য আরো কামার আছে।

যাঁরা হাওয়া বদলাতে সাঁওতাল পরগণা যান, কিংবা যাঁদের বাড়ি লালমাটির দেশে যথা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, ধান মাপার পাইগুলি অথবা কুন্‌কে পিতলের হয়, এবং হাট-বাজারে দেখা যায়। কাঠের যে হয় না, এমন কথা আমরা বলছি না ; কিন্তু পিতল নিয়েই আমাদের কথা।

এই পিতলের কুন্‌কে অথবা পাইগুলি ভারি সুন্দর দেখতে। এর আকারটা বাটির মতন, ঠিক এমনি আকারের নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন কোসন আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না, তাই অনেক শৌখিন লোকের কাছে এর চেহারাটা ভারি আনন্দদায়ক। তাঁরা এগুলি খরিদ ক'রে বাড়ি নিয়ে আসেন এবং আর পাঁচ শৌখিন জিনিসের সঙ্গে খুব যত্ন ক'রে রাখেন। বন্ধুবান্ধবরা তারিফ করেন। অনেক বিদেশীও এগুলি কিনে নিয়ে যায়।

পাই-এর ধার ঘেঁষে, বেড় ঘিরে, বহু নকশা থাকে — মাছ থাকে, জোয়ারের জলরেখা থাকে, ঢ্যাড়া-কাটা, দাঁড়ি কাটা অনেক জ্যামিতিক রেখা থাকে। দেখে মনে হবে—ওইটুকু ব্যাপার

করতে বহু ভাবতে হয়েছে, অনেক চিন্তা এর পিছনে রয়েছে। মাছের চিহ্ন ভারি লক্ষ্মী। মাছ-চিহ্ন অনেক অনেক জায়গায় দেখা যাবে, এমন কি 'ত্রিরত্ন' প্রতীকের দু'পাশে দু'টি মাছ আমরা দেখেছি। মীন অবতার বহু ব্যাপারে রয়েছে। এখানে, সত্যি বলতে, মাছ-চিহ্ন প্রতীক হয়ে নেই। যেমন সুন্দর সুন্দর আঙুলের চুটকিতে পলকাটা রুপোর মাছটি থাকে, তেমনি শুধু পলাতক-ভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীটি এখানে গোটা মাছটির মধ্যে রেখার জোর বাঁধনে দেশ বা স্পেস্ হয়ে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সেই ভঙ্গীটি আপনা থেকেই এসে যায়। সোজা ছক হলেও মাছটি মনে হবে যেন কিছু বাঁকা — খুব সোহাগ ক'রে মাছটি বসিয়ে দিয়েছে।



পাই এ যে ধরনের কাজ, ঠিক অবিকল সেই ধাঁচের কাজ করা বহু সামগ্রী দেখা যাবে। গৃহস্থের নিত্যপূজার ঘট থেকে শুরু ক'রে রকমারি প্রয়োজনীয় জিনিস এই রীতিতে তৈরি। দেবদেবীর মূর্তি, কাজললতা, প্রদীপ ইত্যাদি।

পৌষ মাসে যখন ধান কাটা প্রায় মাঠ থেকে খামারে উঠে আসে,

মাঠে মাঠে যখন গুড়ের ভাটি বসে — বোল্‌তা মৌমাছি ভারি ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করে, বদ্‌রাগী শব্দ উত্থিত হয়, তখন গ্রামের বার-সীমানায় ভাটি জ্বালাবে ঢোক্‌রারা — বুনোরা। এরা ছেলে-পুলেদের কাছে খুব অবাকের বিষয়। এদের কাঁধে বড় থলি, কখনো ঝুড়ি কাঁধে বা বাঁকে। বাঁকে অনেক এটা সেটা। কখনও কখনও মনে হয় এরা ভেল্কী দেখায়, যাদু জানে।

অনুশীলনী

১। বাংলার অষ্টকামারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যা জান লেখো।

২। ঢোক্‌রা কামার কোন্ ধাতু দিয়ে কোন্ কোন্ অঞ্চলে কাজ করে?

৩। বাংলায় 'লালমাটির দেশ' বলতে কোন্ কোন্ জেলাগুলি বোঝায়?

৪। ঢোক্‌রা কামারদের তৈরি-করা পাইগুলি কেন আকর্ষণীয় হয়?

৫। ব্যাখ্যা করো ঃ

(ক) মাছের চিহ্ন ভারি লক্ষী।

(খ) কখনও কখনও মনে হয় এরা ভেল্কী দেখায়, যাদু জানে।

৬। গ্রামের বার-সীমানায় ঢোক্‌রাদের ভাটি জ্বালানোর বিবরণ লেখো।

৭। বিশেষ্য পদে পরিবর্তন করো ঃ

শৌখিন, উচ্ছ্বসিত, জ্যামিতিক, প্রয়োজনীয়, উত্থিত, বদ্‌রাগী, উল্লিখিত।

৮। চলিত ভাষা থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর করো ঃ

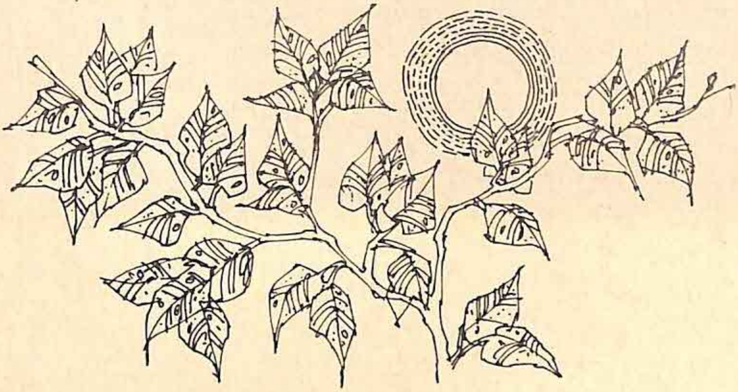
পাই-এ যে-ধরনের কাজ, ঠিক অবিকল সেই ধাঁচের কাজ-করা বহু সামগ্রী দেখা যাবে। গৃহস্থের নিত্যপূজার ঘট থেকে শুরু ক'রে রকমারি প্রয়োজনীয় জিনিস এই রীতিতে তৈরি।

আগামী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

(১৯৩৩-১৯৫৫)ঃ জন্ম—কলকাতা। পিতা নিবারণচন্দ্র। কিশোর-কবি সুকান্তের মৃত্যু হয় মাত্র ২১ বছর বয়সে। কিন্তু তার মধ্যেই তিনি কবিতা রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ করেন। 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ
মাটিতে লালিত, ভীরু শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।



যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে।
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা।

তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেবো সবার সম্মুখে
ফোটাবো বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।

অনুশীলনী

১। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আগামী' কবিতাটির কোন্ লাইনটি তোমার সব চাইতে ভালো লাগে ? কেন ?

২। ব্যাখ্যা করো ঃ

'ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে'।

৩। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।

৪। বাক্য তৈরি করো ঃ

অঙ্কুরিত, লালিত, স্বপ্ন, তুচ্ছ, মর্মরধ্বনি, বিদীর্ণ, উদ্দাম, দৃপ্ত, বিস্মিত, প্রতিবেশী।

৫। বিশেষ্য পদে পরিবর্তিত করো ঃ

জীবন্ত, অঙ্কুরিত, সন্দিগ্ধ, দৃপ্ত, বিস্মিত।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

মৃত, লালিত, নগণ্য, ক্ষুদ্র, স্বপ্ন।

ফিরিওয়ালার ডাক

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত



রাস্তায় রাস্তায় ফিরিওয়ালাদের ডাক ঠিক কবে আর কোথায় শুরু হয় কে জানে। আদিম যুগে গুহাবাসী মানুষ বাঁচবার জন্য জন্তু-জানোয়ার শিকার করত, বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফলমূল কুড়িয়ে বেড়াত। তারপর ক্রমে ক্রমে লোকে চাষবাস করতে শিখল, হাঁড়ি-কুড়ি গড়তে শিখল, তাঁত বুনতে শিখল। গুহা ছেড়ে, যাযাবর জীবন ছেড়ে তারা স্থায়িভাবে গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে বাস করতে লাগল। তখন থেকেই মানুষেরা জিনিসপত্র লেনদেন, কেনাবেচা করতে আরম্ভ করে। অনেক শ বছর আগে মানুষের সমাজ-জীবনে এই সময়েই ফিরিওয়ালাদের আবির্ভাব হয়।

জাতকের প্রথম নিপাঠের তৃতীয় কাহিনীতে বলা হয়েছে যে বুদ্ধদেব তাঁর এক পূর্ব জন্মে সেরি রাজ্যে ফিরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন। সেই রাজ্যের অন্য অনেক ফিরিওয়ালাদের মতন বোধিসত্ত্বও রাস্তায়

রাস্তায় 'কলসি কিনবে, কলসি কিনবে' হাঁক দিয়ে বেড়াতেন। আসল জাতকে 'কচ্ছপুটবানিজো' কথাটা আছে। ঈশানচন্দ্র ঘোষ তাঁর অতুলনীয় অনুবাদে এই কথাটির যে মানে করেছেন তা হল 'যে বণিক পণ্যভাণ্ড কক্ষে লইয়া ফিরি করিয়া থাকে'। 'কলসি কলসি' ডাক দিলেও এই কাহিনী থেকে জানা যায় যে তারা গয়নাগাঁটি ও আরও অন্য জিনিস ফিরি ক'রে বেড়াত।

পণ্ডিতেরা প্রাচীন মহাকাব্য, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ-উপপুরাণ ইত্যাদি থেকে পৃথিবীর নানান দেশে ফিরিওয়ালাদের সম্বন্ধে এই ধরনের অনেক উদাহরণ দিতে পারেন। তাছাড়া এখনও যে সব গাইয়ে-বাজিয়েরা কলকাতায় ও গ্রামাঞ্চলের হাটে-মাঠে গান ক'রে রুজি রোজগার ক'রে বেড়ায়, সভ্যতার সব যুগেই সব দেশেই তাদের পূর্বপুরুষদের দেখা যেত। যেমন প্রাচীন গ্রীসের হোমার-এর মহাকাব্যের কথক, ইউরোপে মধ্যযুগের ত্রুবাদুর, রাজস্থানের চারণ কবি আর বাংলার আউল-বাউল আর গান গেয়ে ছবি-দেখানো পটুয়া।

দশম শতাব্দীতে লেখা 'সহস্র-এক আরব্য রজনী'র সাতশ বত্রিশ থেকে সাতশ চুয়াত্তর রজনীতে শাহ্‌জাদী আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপের যে গল্প বলেন তা ভুবন-বিখ্যাত। সেই গল্পে দেখা যায় যে, গরীব দরজির ছেলে আলাদিন তার আশ্চর্য প্রদীপের দৌলতে চীনের সুলতানের মেয়েকে বিয়ে করে। তারপর একজন দুষ্টু যাদুকর 'পুরনোর বদলে নতুন আলো', 'পুরনোর বদলে নতুন আলো' হাঁক দিয়ে আলাদিনের অবর্তমানে সেই আলোটা হাতিয়ে নিয়ে তাকে সমূহ বিপদে ফেলে। এরপর কি ক'রে আলাদিন আবার তার আশ্চর্য প্রদীপ উদ্ধার ক'রে তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে চীনের সুলতান হয়ে জীবন কাটায় সে কথাটা সকলেই জানে। গল্পটা চীন দেশ নিয়ে হলেও ফিরিওয়ালাদের ব্যাপারটা আরব ও মধ্য প্রাচ্যের অন্য অন্য দেশ সম্বন্ধেও খাটে।

অনুশীলনী

১। 'অনেক শ বছর আগে মানুষের সমাজ জীবনে এই সময়েই ফিরিওয়ালাদের আবির্ভাব হয়।' লেখক কোন্ সময়ের কথা বলছেন? ফিরিওয়ালারা সমাজে কীভাবে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করল?

২। জাতকের প্রথম নিপাঠের তৃতীয় কাহিনীতে বুদ্ধদেবকে আমরা তাঁর পূর্বজন্মে সেরি রাজ্যে কি ধরনের ফিরিওয়ালা হিসেবে দেখতে পাই?

৩। 'যে বণিক পণ্যভাণ্ড কক্ষে লইয়া ফিরি করিয়া থাকে'—ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা কাদের সম্পর্কে? এইসব ফিরিওয়ালা-বণিকরা কি কি জিনিস ফিরি করত?

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাওঃ

(ক) প্রাচীন গ্রীসের হোমার।

(খ) ইউরোপে মধ্যযুগের ত্রুবাদুর।

(গ) রাজস্থানের চারণ-কবি।

(ঘ) বাংলার আউল-বাউল আর ছবি দেখানো পটুয়া।

৫। আলাদিন আর আশ্চর্য প্রদীপের গল্প দশম শতাব্দীর কোন্ বইতে পাওয়া যায়? কে গল্পটি বলেন? দুষ্টু যাদুকর ফিরিওয়ালা সেজে কী বলে হাঁক দেয়?

৬। কলকাতার কোনো গ্রীষ্মের দুপুরে তুমি যে সব ফিরিওয়ালার ডাক শুনেছ তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লেখো।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করোঃ

কেনাবেচা, পণ্যভাণ্ড, মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, গ্রামাঞ্চল, পূর্বপুরুষ।

৮। বিপরীত লিঙ্গ নির্ণয় করোঃ

সুন্দরী, স্ত্রী, শাহ্‌জাদী, ছেলে, সুলতান।

বাংলার বন্যা

দিনেশ দাস

(১৯১৩-১৯৮৫) ঃ জন্ম—কলকাতা। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পাস ক'রে নানাবিধ কাজ করেন। শেষে চেতলা হাই স্কুলে শিক্ষকতা ক'রে অবসর নেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কাস্তে'—সেজন্য তিনি 'কাস্তে কবি' নামে খ্যাত। 'রাম গেছে বনবাসে' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

তোমরা কি চুপচাপ ?

দূরে ঐ দেখছো না
আকাশের লাঞ্ছনা ?
ওড়ে ঐ ছেঁড়া কালো উড়নি।



এলোমেলো
ঝড় এলো ঝড় এলো,
ঘুরপাক খায় লাখো ঘূর্ণি।
ঘর ভাঙ্গে ঝুপঝাপ—
তোমরা কি চুপচাপ?
ঢেউয়ের মতোই জল মোচড়ায়,
ঢুলে ওঠে ফুলে ওঠে আছড়ায় পাছড়ায়
পাল নামে থল ভাঙ্গে
ছেঁড়ে কাছি অস্থির ;
পড়ে তীর ওরে নীড় চৌচির।
শহরের আড়ালেতে জমে ঘুম ;
তোমরা কি চুপচাপ নিঝ্‌ঝুম?

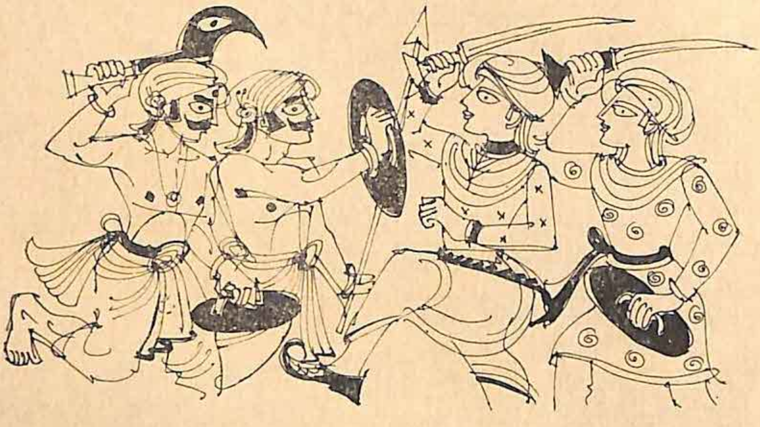
অনুশীলনী

১। 'তোমরা কি চুপচাপ?'—কথাটির তাৎপর্য কি?
২। কবিতাটি মুখস্থ ক'রে আবৃত্তি করো।
৩। কবিতাটির সারাংশ লেখো।
৪। অর্থ লেখো ঃ
লাঞ্ছনা, ঘূর্ণি, অস্থির, চৌচির, নিঝ্‌ঝুম, থল, নীড়।
৫। বাক্য তৈরি করো ঃ
এলোমেলো, ঘুরপাক, কাছি, আড়ালে, ঢুলে।
৬। পদ পরিবর্তন করো ঃ
অস্থির, লাঞ্ছনা, জল, ঘুমন্ত, ঝড়।

ডাকাত

মহাশ্বেতা দেবী

(১৯২৬-)ঃ সাহিত্যিক মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)-এর কন্যা, বহরমপুরের মেয়ে। শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় শিক্ষালাভ। এম্ এ পাস ক'রে অধ্যাপনা করতেন। আদিবাসী সমাজের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ; তাঁর রচনায় এদের জীবন প্রতিফলিত। 'অরণ্যের অধিকার' বই লিখে তিনি আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।



কথায় বলে—

মাসিপিসি বনগাঁ-বাসী
বনের মধ্যে ঘর
কখন মাসি বললে না গো
খই মোয়াটা ধর।

তা বলে খেতার মাসি তেমন না। পউষের হিমহিম ভোরে খেতা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মাসি ওকে ডেকে দিল। বলল, 'অ খেতা,

উঠবিনি আজ? দেখ গা যেয়ে ফাঁদ পেতে এসেছিনু, তাতে কি পড়েছে।'

'কি পড়েছে?'

'সজারু এট্টা। কেমন মোটা রে! বেন্নুন হবে।'

'কখন?'

'আতে।'

'এখন করবি না?'

'ধুর বোকাটা। আতে আজ তোর মেসো আসবে, বলাই, কানাই আসবে তা জানু?'

'মোর তরে কি আনবে?'

'সে দেখিস খ'ন। এখন যা বাবা, পলোটা চাপা আছে, চাট্টি মাছ পড়ল কিনা দেখ গা। আর শিম ক'টা পেড়ে দে যা। বামুন-বাড়ি যেতে হবে।'

খেতা মুখ ধুল, কড়কড়ে ভাত খেল। মাসির পুকুরের নিচে চার-চারটে কুয়ো আছে। চৈত্র-বৈশাখেও পুকুরের জল দেখ গে কানায় কানায়। পুকুরের ওপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের ওপাশে রাস্তা। অনেক আগে, খেতার বাবা যখন সবে ধুতি পরতে শুরু করেছে তখন নাকি দেশে বর্গীরা এসেছিল।

তখন দেশে খুব যুদ্ধ হত। যুদ্ধ দেখতে দেখতে খেতার বাবা জোয়ান ছেলে হয়ে গেল। ন' দশ বছর ধরে শুধু যুদ্ধ হয়েছিল।

সেই সময়ে এইসব রাস্তা তৈরি হয়। রাস্তা দিয়ে নবাব হাতি, ঘোড়া, সেপাই, লস্কর নিয়ে যুদ্ধ করতে যেতেন।

খেতার বাবা যুদ্ধে যায়নি। তবে খেতার জ্যাঠা, জ্যাঠার শালা, ছোট ঠাকুর্দা, সবাই যুদ্ধে গিয়েছিল।

খেতার যে মাসি, তার শ্বশুরও নাকি যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধে গিয়েছিল, যুদ্ধ করেছিল আর নবাবের দপ্তর থেকে সর্দার খেতাব নিয়ে ফিরে এসেছিল।

তখন এই ইন্দ্রাইল, নাড়াজোল, কান্দী, চাকুলে সব জায়গার লোকেরা লড়াই করত।

সড়কি চালাত, বর্শা চালাত, বল্লম ছুঁড়ত। কেউ বা তীর-ধনুকে ওস্তাদ হত। কেউ লাঠি চালাত বন বন বন। লাঠির মাথাটা লোহায় বাঁধানো, তাতে কাঁটা বসানো।

কেউ বাঁশের লাঠি চালিয়েই অবাক ক'রে দিত।

তখন দেশের অবস্থা অন্য রকম ছিল। সেই যে যুদ্ধ হয়েছিল সে সময়ে নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ।

নবাবের রাজত্ব ছিল বাংলা, বিহার উড়িষ্যা জুড়ে। নবাবের রাজত্বে অনেক জমিদার, ভুইঞা রাজা ছিলেন।

খেতার বাপ-ঠাকুর্দার মতো মানুষরা সেই সব জমিদারের কাছ থেকে জমি পেত আর চাষ করত।

তার বদলে তারা কি করত ?

জমিদারের দরকারে অদরকারে লাঠি, বর্শা, তীর হাতে লড়তে যেত।

বর্গীদের সঙ্গে যখন সেই কবে যেন যুদ্ধটা হয় তখনো নবাবের হাজার সৈন্য। তার মধ্যে রাঢ় আর দক্ষিণ দেশের বাঙালী যে কত তার লেখাজোখা নেই।

নবাবের নিজের সৈন্যরা লড়েছিল, তা ছাড়া বর্গীরা যখন বছরের পর বছর আসতেই থাকল, তখন জমিদাররা যে যার জায়গায় যে যার সৈন্য নিয়ে লড়তে লাগলেন।

খেতাদের সবাই হল গিয়ে বুনো-বিষ্টুপুরের রায়রাজাদের প্রজা।

যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে খেতার মাসির শ্বশুর এখনো যুদ্ধের গল্পটল্প বলে।

অনুশীলনী

১। খেতার বাবা যখন সবে বড় হয়ে উঠছেন তখন দেশে কারা হানা দিয়েছিল ? এদের নিয়ে যে সব ছড়া আছে তার একটা অন্ততঃ লেখো।

২। নবাব আলিবর্দী খাঁ কোথাকার নবাব ছিলেন ? তাঁর রাজত্বকালে এই যে যুদ্ধ, তা কতদিন চলেছিল ?

৩। খেতার মাসির শ্বশুর নবাবের দপ্তর থেকে 'সর্দার' খেতাব পেল কেন ? সেই সময় কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ হত ?

৪। নবাবের সঙ্গে বর্গীদের লড়াই যখন তুঙ্গে তখন নবাবের কত সৈন্য ছিল আর তারা প্রধানতঃ কোন্ দেশ থেকে আসত ?

৫। খেতাদের জীবনে বুনো-বিষ্টুপুরের ডাকাত তাহলে কারা ?

৬। বুনো-বিষ্টুপুরের এই উপভাষা শুদ্ধ-চল্‌তি ভাষায় লেখো ঃ

দেখ গা, সজারু এট্টা, বেন্নন হবে, আতে, ধুর বোকাটা, তা জানু, পলোটা।

৭। বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

বোকা, কড়কড়ে, যুদ্ধ, গিয়েছিল, নিজের, প্রজা।

৮। প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তরিত কর ঃ

(ক) সে সময়ে নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ।

(খ) তারা জমিদারের কাছ থেকে জমি পেত।

(গ) নবাবের নিজের সৈন্যরা বর্গীদের সঙ্গে লড়েছিল।

(ঘ) খেতাদের সবাই ছিল রায়রাজাদের প্রজা।

(ঙ) খেতার বাবা যুদ্ধে যায়নি।

গোপীযন্ত্র

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

(১৮৮২-১৯৭০) জন্ম—কোগ্রাম, বর্ধমান। বি. এ. পাস ক'রে শিক্ষকতা করেন এবং মাথবুন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে অবসর গ্রহণ করেন। তার কবিতায় ভক্ত মন ও গ্রামীণ সরলতা প্রকাশিত। 'উজানী', 'বনতুলসী', 'অজয়' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

সেতার আমি নই তো জানি, নইকো আমি সারঙ্গ।
তবু আমি বাজবো খানিক ক'রো না কেউ বারণ গো।
অসম্ভব বা আজগুবি যা,
সেটা বুঝেও যায় না বোঝা,
আমি তারি কারবারী যে, জানি নাকো কারণ গো॥



আমি ভবের পাগলা পথিক, দমকা হাওয়া বসন্তর,
উড়িয়ে বেড়াই ফাগের পরাগ, পথ যে আমার স্বতন্তর।
চাই অচেনায় চিনিয়ে দিতে
আনন্দকে ছিনিয়ে নিতে,
রসিককে রাগ-রসের মাঝে করতে যে চাই ধারণ গো॥

ধনী মানীর আদর পেতে করি নাকো প্রাণান্ত,
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ।
দু'দণ্ডেরি আলাপই খুব,
বাজিয়ে যাবো গাবগুবাগুব,
অকূলের কোন্ কেন্দ্রবিন্দে করবো গিয়ে পারণ গো॥

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা করো ঃ
(ক) আমি ভবের পাগলা পথিক, দমকা হাওয়া বসন্তর।
(খ) ধনী মানীর আদর পেতে করি নাকো প্রাণান্ত।

২। কবিতাটির প্রথম পাঁচ লাইন মুখস্থ ক'রে লেখো।

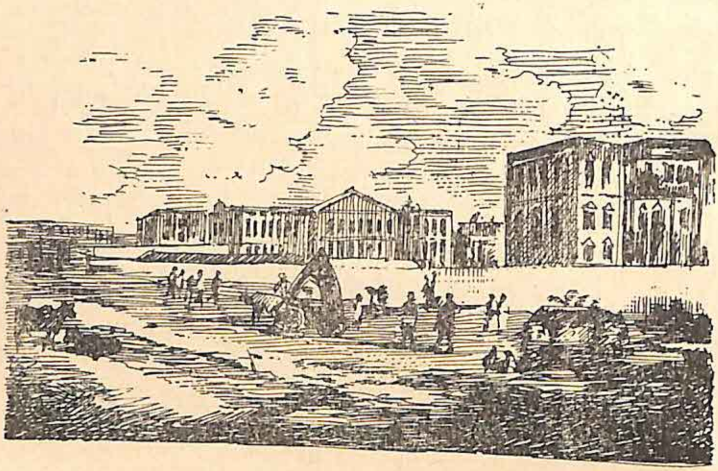
৩। শূন্যস্থান পূর্ণ করো ঃ
(ক) উড়িয়ে বেড়াই ——, পথ যে আমার স্বতন্তর।
(খ) —— সহজ খুঁজি —— পাই ——।

৪। বাক্য তৈরি করো ঃ
সেতার, সারঙ্গ, কারবারী, প্রাণান্ত, অকূল।

৫। প্রতিশব্দ লেখো ঃ
বারণ, হাওয়া, ধনী, আদর, আনন্দ।

কলকাতা কি হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা ?

পি. থনকপ্পন নায়ার



কোনো শহর একটিমাত্র লোকের কল্পনার ফলে গড়ে উঠেছে এমন দাবি প্রাচ্যে কলকাতা ছাড়া আর কোনো শহর করতে পারবে না। কলকাতা যে জব চার্নকের কল্পনার ফল এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ১৫৫১-র ২৫ ফেব্রুয়ারি 'ট্রান্সপোর্ট' নামে ছোট্ট জলযানটি উইলিয়াম বেভিস ও তাঁর সঙ্গী মিঃ বিচার হুগলি নদীতে ভাসাবার পর থেকে আরো বহু ইংরেজ জাহাজ ভাসিয়েছেন তাঁদের 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়িয়ে, কিন্তু ইংরেজদের ব্যবসা রক্ষার্থে সুরক্ষিত বসতি স্থাপনের কথা ভাবতে পারেন নি। ব্রিটিশ শক্তির মহিমা ভারতের মাটিতে রোপণ করার কাজটি জব চার্নকের জন্যই পড়ে ছিল।

একথা সত্য নয় যে, কলকাতার ভিত্তিভূমিটি নির্ধারিত হয়েছিল মহামহিম এজেন্ট জব চার্নকের এক মধ্যদিনের বিশ্রাম-স্থলটিকে

কেন্দ্র ক'রে। আর শহরটিও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে নি। একথাও অসত্য যে কলকাতা 'হঠাৎ-গজানো', 'সহসা-নির্মিত' পলিমাটির উপরে স্থিত ও উত্তোলিত এক শহর। চার্নক যে কলকাতা শহরের জায়গাটি নির্বাচন করেছিলেন, তার মূলে ছিল হুগলি নদী সম্পর্কে তাঁর তিন দশকের অভিজ্ঞতা। এর আগে একটি বন্দর ও শহর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিনি কয়েকবার করেছেন। সুতানুটির আরো দক্ষিণে উলুবেড়িয়া ও হিজলিতে তিনি কিছুটা পরীক্ষা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই জায়গাটি বাছাইয়ের আগে দু'বার তিনি সুতানুটিতে বাস ক'রেও গেছেন।

সুতানুটিতে যে জায়গাটা চার্নক মনোনীত করলেন, সমুদ্রগামী জাহাজের যাতায়াতের পক্ষে জায়গাটা খুবই সুবিধাজনক। এ ছাড়া আমরা আগেই বলেছি, সুতানুটির ভৌগোলিক সুবিধা চার্নক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

১৬৬৭-তেই লণ্ডন কোম্পানীর কোর্ট অফ কমিটিস পূর্বভারতীয় নাবিকদের এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন গঙ্গার খাল, গভীরতা, প্রবেশমুখ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ রাখেন এবং একটা লিখিত হদিশ রাখেন যাতে নদীর প্রকৃত গভীরতা, প্রবেশপথ, স্রোতের গতি ও নদীগর্ভস্থ বালির পরিবর্তন ইত্যাদি বোঝা যেতে পারে।

চার্নকই প্রথম ইংরেজ যিনি নদীবন্দরের সুবিধা বুঝতে পেরেছিলেন। সুতানুটি জায়গাটা তাঁর মনঃপূত হয় ও এখানেই ভবিষ্যৎ কলকাতা শহরের সূত্রপাত ঘটে। হিজলি, উলুবেড়িয়া ও হুগলির যেসব জায়গায় চার্নক ছিলেন, সেগুলির তুলনায় সুতানুটি জায়গাটি নৌবাহিনী সুরক্ষিত করার পক্ষে অনেক বেশি নিরাপদ ও নির্ভরশীল মনে হয়েছিল।

মোগল বাহিনী ইংরেজদের আক্রমণ করতে চাইলে আরো অনেক উত্তরে নদী পার হয়ে দক্ষিণদিকে স্থলপথে আসতে হত।

সোজাপথে নদী পার হতে গেলে আক্রমণকারীরা অনিবার্য বিপদের মুখে পড়ত, কারণ ইংরেজবাহিনী নদীবক্ষে সতর্ক প্রহরা রেখেছিল।

শত্রুপক্ষ সুতানুটির দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে ইংরেজরা সহজেই তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ক'রে তাদের বিপদে ফেলতে পারত।

এ ছাড়া পুবদিকে লবণ হ্রদ ও আশপাশের জলা-জঙ্গল সেদিক থেকে অগ্রসর হওয়ার স্বাভাবিক বাধাস্বরূপ ছিল। অন্যদিকে সুতানুটি থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ফ্যাক্টরিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধাও ছিল।

অনুশীলনী

১। প্রাচ্যে কলকাতা ছাড়া আর কোনো শহর কী দাবি করতে পারে যে, একটিমাত্র লোকের কল্পনা, চিন্তা আর গবেষণার ফলে তা গড়ে উঠেছে? কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার দূরদৃষ্টির বিষয় লেখো।

২। কলকাতা শহর যে জব চার্নকের উদ্ভট চিন্তার ফল নয় এবং তা যে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠেনি, তা কীভাবে বোঝা যায়?

৩। ...'সুতানুটির ভৌগোলিক সুবিধা চার্নক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।'—এই সুবিধার মধ্যে সব চাইতে বড় বিষয় কোন্‌টি?

৪। লেখক কেন বলেছেন যে, চার্নকই প্রথম ইংরেজ যিনি ভারতবর্ষের নদী বন্দরের সুবিধা বুঝতে পেরেছিলেন?

৫। সুতানুটিকে ঘিরে চার্নক যে বাস্তব যুক্তির ফাঁদ পেতেছিলেন, তার মধ্যে মোগল বাহিনীকে হারাবার চিন্তাও যে জড়িত ছিল তা লেখক কী ভাবে বোঝাচ্ছেন?

৬। অর্থ লেখো :

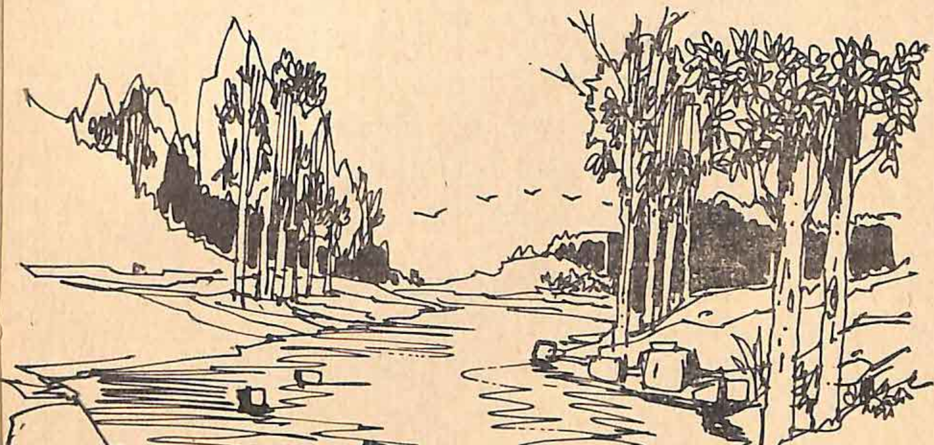
দ্বিমত, ইউনিয়ন জ্যাক, রক্ষার্থে, সুরক্ষিত, মহামহিম, ভিত্তিভূমি, সমুদ্রগামী, সুবিধাজনক, নদীগর্ভস্থ, অনিবার্য, প্রহরী, বাধাস্বরূপ।

নিভে আসে

মনীশ ঘটক

(১৯০২-১৯৭৯) ঃ জন্ম—রাজশাহী, পূর্ববঙ্গ। পরে বহরমপুরে থাকতেন। পিতা সুরেশচন্দ্র, মাতা ইন্দুবালা। সাহিত্যক্ষেত্রে 'যুবনাশ্ব' নামে খ্যাত। কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখতেন।

নিভে আসে আলো নয়নের সীমানায়
নভোতল নীল নিষ্ফল নিরাশায়।
নিঃসীম নিঃসঙ্গ নীরব নিশা,
শিহরে সভয়ে সমীরণ হারাদিশা।



রোরুদ্যমানা অরুন্ধতীর ব্যথা
সপ্তর্ষির নির্বাক মুখরতা

পম্পার বুকে বিস্তারে প্রতিচ্ছবি—
আজ মনে হয় অলীক স্বপ্ন সবি।

ব্যর্থ অলীক অপার্থিবের তরে
অতন্দ্রযাম যাপন জনম ভরে।

অনুশীলনী

১। 'নিভে আসে' বলতে কবি কী নিভে যাবার কথা বলেছেন?

২। ব্যাখ্যা করো ঃ

'ব্যর্থ অলীক অপার্থিবের তরে অতন্দ্রযাম যাপন জনম ভরে।'

৩। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লেখো ঃ

অরুন্ধতীর ব্যথা ; সপ্তর্ষির নির্বাক মুখরতা ; পম্পার বুকে ; অলীক স্বপ্ন ; জনম ভরে।

৪। কবিতাটি মুখস্থ করো।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ

নভোতল, নিষ্ফল, নিরাশা, সপ্তর্ষি, প্রতিচ্ছবি।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

হারাদিশা, সপ্তর্ষি, অপার্থিব, অতন্দ্রযাম, নিষ্ফল।

মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প

সত্যজিৎ রায়

(১৯২১-   ): জন্ম—কলকাতা। পিতা শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার রায়, পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। গল্প, কবিতা, গান, ছবি আঁকা, চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে বিশ্ববিখ্যাত।

মোল্লা এখন কাজী, সে আদালতে বসে। একদিন এক বুড়ী তার কাছে এসে বলল, 'আমি বড়ই গরীব। আমার ছেলেকে নিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়েছি কাজীসাহেব। সে মুঠো মুঠো চিনি খায়, তাকে আর চিনি জুগিয়ে কূল পাচ্ছি না। আপনি হুকুম দিয়ে তার চিনি খাওয়া বন্ধ করুন। সে আমার কথা শোনে না।'

মোল্লা একটু ভেবে বলল, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এক হপ্তা পরে এসো, আমি একটু বিবেচনা ক'রে তারপর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো।'

বুড়ী হুকুমমত এক হপ্তা পরে আবার এসে হাজির।

মোল্লা তাকে দেখে মাথা নাড়ল—'এ বড় জটিল মামলা। আরো এক হপ্তা সময় দিতে হবে আমাকে।'

আরো সাত দিনের পরেও সেই একই কথা। অবশেষে ঠিক এক মাস পরে মোল্লা বুড়ীকে বলল, 'কই, ডাকো তোমার ছেলেকে।'

ছেলেটি আসতেই মোল্লা তাকে হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'দিনে আধ ছটাকের বেশি চিনি খাওয়া চলবে না। যাও।'

বুড়ী মোল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল, কাজীসাহেব।'

'বলো।'

'এই নিয়ে চারবার ডাকলেন কেন আমাকে ? এর অনেক আগেই ত আপনি এ হুকুম দিতে পারতেন।'

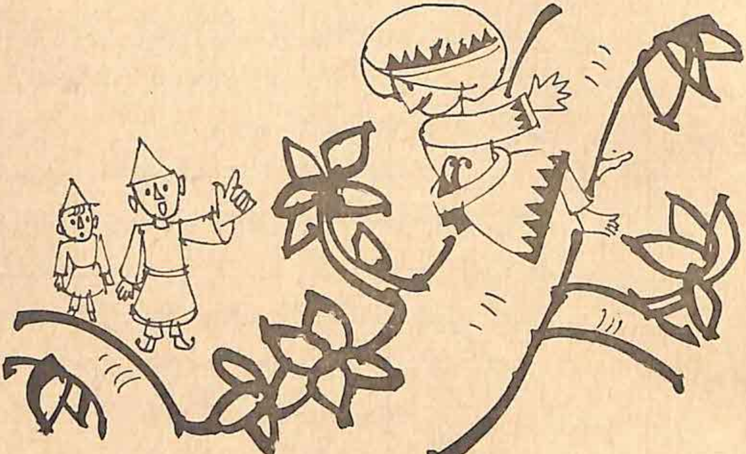
'তোমার ছেলেকে হুকুম দেবার আগে আমার নিজের চিনি খাওয়ার অভ্যেসটা কমাতে হবে ত!' বলল নাসীরুদ্দীন।

❋

রাস্তার কয়েকটি ছোকরা ফন্দি করেছে তারা মোল্লাসাহেবের চটি জোড়া হাত করবে। একটা লম্বা গাছের দিকে দেখিয়ে তারা মোল্লাসাহেবকে বলল, 'ওই যে গাছ দেখছেন, ওটা চড়ার সাধ্যি কারুর নেই।'

'আমার আছে', বলে মোল্লাসাহেব চটিজোড়া পা থেকে খুলে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে গাছটায় চড়তে শুরু করলেন।

বেগতিক দেখে ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল, 'ও মোল্লাসাহেব, ওই গাছে আপনার চটিজোড়া কোনো কাজে লাগবে কি ?'



মোল্লাসাহেব গাছের উপর থেকে জবাব দিলেন, 'গাছের মাথায় যে রাস্তা নেই তা কে বলতে পারে ভাই ?'

❋

এক পড়শী এসেছে নাসীরুদ্দীনের কাছে এক আর্জি নিয়ে।

'মোল্লাসাহেব, আপনার গাধাটা যদি কিছুদিনের জন্য ধার দেন ত বড় উপকার হয়।'

'মাপ করবেন', বলল নাসীরুদ্দীন, 'ওটা আরেকজনকে ধার দিয়েছি।'

কথাটা বলামাত্র বাড়ির পিছন থেকে গাধা ডেকে উঠে তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে দিল।

'সে কি মোল্লাসাহেব ! ওটা আপনারই গাধার ডাক শুনলাম না ?'

নাসীরুদ্দীন মহারাগে লোকটার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিতে দিতে বলল, 'আমার কথার চেয়ে আমার গাধার ডাককে যে বেশি বিশ্বাস করে, তাকে কোনোমতেই গাধা ধার দেওয়া চলে না।'

অনুশীলনী

১। মোল্লা কাজী হিসেবে বুড়ীকে বার বার ঘুরে আসতে বলেছিলেন কেন? গল্পটি ছোট ক'রে নিজের ভাষায় লেখো।

২। মোল্লা সাহেবের চটি জোড়া হাত করতে গিয়ে ছেলের দল বেকুব বনলো কীভাবে ?

৩। নিজের গাধাটিকে পড়শীর আর্জি মত মোল্লা সাহেব তাকে না দেবার পক্ষে কী যুক্তি দেখালেন ?

৪। মোল্লা নাসীরুদ্দিনের আর কোনো গল্প তুমি পড়েছ কী? পড়ে থাকলে যেটি সব চাইতে ভালো লেগেছে সেটি লেখো।

৫। লেখক মোল্লা সাহেবের গল্পের ভেতর দিয়ে যে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি তোমার কেমন লেগেছে? কেন ?

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ঃ

বেগতিক, কাজীসাহেব, চটিজোড়া, মহারাগ।

৭। নিচের বিশেষ্যপদগুলির বিশেষণ রূপ লেখো ঃ

গরীব, মাস, গাছ, দিন, কথা, বিশ্বাস।

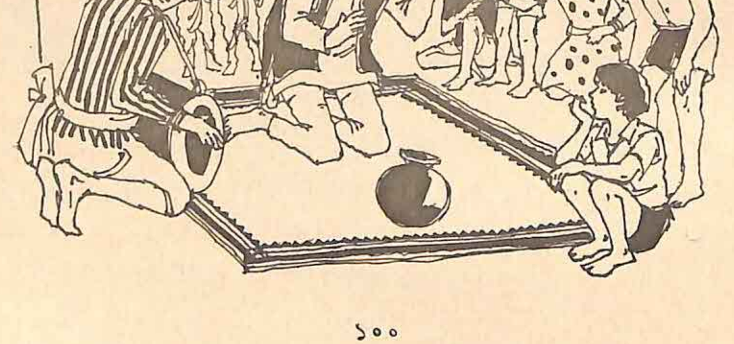
খেলা দেখে যান

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

(১৯১৯-) জন্ম—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র, মাতা যামিনী দেবী। খুব অল্প বয়সেই 'পদাতিক' কবিতার বই ছাপা হয়। তারপর গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং কিশোরদের বই অনেক লিখেছেন।

মাথার ওপর খাটানো নীল
বিনিপয়সার তাঁবু
নিচে সবুজ গাল্‌চে পাতা
খেলা দেখে যান, বাবু।

ঢোলক বাজে ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌
ভর সন্ধ্যেবেলা
হাজার ঢেউয়ের হাততালিতে
জমে উঠেছে খেলা।



বাঃ বাহবা ! বাহবা বাঃ ।
সাবাস বলিহারি—
হাঁড়ির মধ্যে মাটি আছে, না
মাটির মধ্যে হাঁড়ি !

এই ছিল না এই তো আছে
এই আছে এই ফক্কা !
বুকের মধ্যে রঙের তাস
হরতনের টেক্কা ।

অনুশীলনী

১। (ক) 'মাথার ওপর বিনিপয়সার নীল তাঁবু'—কোন্‌টা ?

(খ) 'নিচে সবুজ গালচে পাতা'—কী ?

২। শেষের আট লাইন মুখস্থ বলো।

৩। রাস্তায় তোমার দেখা বাজিকরদের কোনো খেলার কথা নিজের ভাষায় বলো।

সাপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯৩৪-   ) ঃ জন্ম—ফরিদপুর, পূর্ববঙ্গ। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখায় সমান দক্ষ। ইতিমধ্যেই তিনি অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করেছেন।

সেবার আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম কাশীতে, আমার ছোট মাসীর বাড়িতে। আমার ছোট মেসোর বদলির চাকরি, সেইজন্য আমার খুব মজা হয়েছিল। ছোট মেসো এক-একটা নতুন জায়গায় বদলি হয়ে যান, আর আমি অমনি সেখানে বেড়াতে যাই। এইভাবে আমার মুসৌরী, দেরাদুন, পুনা, তেজপুর, বিশাখাপত্তন—এই সব ভালো ভালো জায়গা দেখা হয়ে গিয়েছিল।

আমার ছোট মেসোকে আসলে বলা উচিত বিরাট মেসো। কারণ তাঁর চেহারাটা ঠিক ভীমের মতন। তেমনি বাজখাঁই তাঁর গলার আওয়াজ, আর সাহসও সাংঘাতিক। কেউ ভয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার শেকহ্যাণ্ড করে না। তিনি এমন বজ্রমুষ্টিতে হাত চেপে ধরেন যে তারপর তিনদিন ব্যথা থাকে। আমার ছোট মাসী আবার তেমনি ভীতু। টিকটিকি, আরশোলা কিংবা মাকড়সা দেখলেই ছোট মাসী প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশ্য আমার সেই বিরাট মেসোও যে পৃথিবীতে একটা জিনিসকে খুব ভয় পান, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম সেবার কাশীতে।

ছোট মাসীরা বাড়ি নিয়েছিলেন বেনারস স্টেশনের উল্টো দিকে একটা নতুন পাড়ায়। পাড়াটা সবে তৈরি হচ্ছে। মাঠের মধ্যে মধ্যে উঠছে নতুন বাড়ি। মাঠগুলো ঝোপ-ঝাড়ে ভরা, খুব বড় বড় ইঁদুর আছে সেইসব মাঠে। এক-একটা ইঁদুরের অন্তত দু'-কিলো তিন কিলো ওজন হবে।

কাশীতে বড্ড ফেরিওয়ালার উৎপাত। সারা দিনে কতরকম ফেরিওয়ালা যে আসে, তার ঠিক নেই। কাঁচের চুড়ি, ছাগলের দুধ, লুধিয়ানার কম্বল, পুরোনো ঘি, কাঠের পুতুল, আচার এসব নানারকম জিনিস বিক্রী করতে ফেরিওয়ালা আসে। এ ছাড়া বাঁদরের নাচ, ভাল্লুকের নাচ দেখাবার লোক আছে।

একদিন এল একটি মেয়ে সাপুড়ে। এর আগে আমি কখনো মেয়ে সাপুড়ে দেখিনি। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার মাঝবয়সী একজন মেয়ে, সঙ্গে গেরুয়া রঙের কাপড়ে মোড়া তিনটে সাপ-ভর্তি ঝোলা, আর সেই মাঝখানটা বেলুনের মতন ফোলানো বাঁশী। সেই বাঁশী সে অনেকক্ষণ ধরে বাজাল আমাদের বাড়ির সামনে। তারপর বলল, 'সাপ খেলা দেখবে গো! এ বাঙালী মাইজী!'

আমরা যে বাঙালী, সে কথা কী ক'রে বুঝল কে জানে। বোধ হয় চিংড়ি মাছ রান্নার গন্ধ পেয়েছিল।

ছোট মাসী বারান্দায় বেরিয়ে এসে মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'না দেখব না! পরশুই ত একজন সাপুড়ে এসে খেলা দেখিয়ে গেল! আমরা কি রোজ রোজ বাঁদরের নাচ, ভাল্লুকের নাচ আর সাপের নাচ দেখব নাকি!'

মেয়ে সাপুড়েটি অনেক কাকুতি মিনতি করল, কিন্তু মন গলল না ছোট মাসীর!

তখন সাপুড়েনী বলল, 'বড় তিয়াস লেগেছে, এক বর্তন পানি দেবে মাইজী?'

কেউ জল চাইলে 'না' বলা যায় না! ছোট মাসী জল আনতে গেলেন আর সাপুড়েনীটি তার ঝাঁপিগুলো নামিয়ে আমাদের বারান্দায় এসে বসল।

ছোট মাসী এক জগ জল এনে দিলেন। সাপুড়েনী জগটা মুখের

কাছে উঁচু ক'রে ধরে ঢক ঢক ক'রে প্রায় অর্ধেকটা জল খেয়ে নিল। তারপর ঝাঁপিগুলোর মুখ খুলে সাপগুলোর গায়ে ছিটিয়ে দিল খানিকটা। অমনি একটা হলদে কালো ডোরাকাটা সরু সাপ সুরুৎ ক'রে বেরিয়ে এসে মেঝের ওপর কিলবিল করতে লাগল! ছোট মাসী ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'শিগগির ওটাকে তুলে নিতে বল্। শিগগির ওকে বিদায় কর্।'

সত্যি কথা বলতে কি, অত কাছে একটা সাপ দেখে আমারও একটু একটু ভয় করছিল, একমাত্র ভয় পেল না ছোট মাসীর দেড় বছরের ছেলে বাবলু। সে খল্‌খল্ ক'রে হেসে বলতে লাগল, 'সাপ ধরব! সাপ ধরব!'



বাজারের মাছওয়ালারা যেমনভাবে সিঙ্গিমাছ ধরে, সাপুড়েনী সেই রকম অবহেলার সঙ্গে সাপটার মাথা চেপে ধরে সেটাকে আবার ঝাঁপিতে পুরে দিল। তারপর উটেরা যেমন ভাবে গন্ধ শোঁকে সেই রকম ভাবে ঠোঁট আর নাক কুঁচকে রেখে বলল, 'মাইজী, তুম্‌হার কোঠীর পাশে মাঠে সাঁপ আছে, পাঁচঠো রুপিয়া দো, সাঁপ ধরে দেবো।'

অনুশীলনী

১। লেখকের ছোটমেসোর বদলির চাকরি হওয়াতে লেখকের মজা হয়েছিল কেন?

২। ছোটমেসোকে বিরাট মেসো বলা যায় কেন? চেহারার বিবরণ লেখো।

৩। লেখকের ছোট মাসীর বাড়িটি বেনারসের কোন্ জায়গায় ছিল? জায়গাটি দেখতে কেমন ছিল?

৪। কাশীতে ফিরিওয়ালাদের বিষয় লেখো।

৫। সাপুড়েদের মাঝবয়সী মেয়ে কী ক'রে বুঝল যে লেখকের ছোট-মাসীরা বাঙালী?

৬। সাপুড়ে মেয়েটি জল খেয়ে সাপেদের গায়ে জল ছেটাল কেন? তারপর কী ঘটল?

৭। কথাগুলোর মানে কী?

(ক) কাকুতি মিনতি, (খ) তিয়াস লেগেছে, (গ) এক বর্তন পানি, (ঘ) তুমহার কোঠীর পাশে, (ঙ) রুপিয়া দো।

৮। মোটা হরফে ছাপা শব্দগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো:

(ক) **আমি কাশীতে** বেড়াতে গিয়েছিলাম।

(খ) ছোট **মাসী** এক জগ **জল** এনে দিলেন।

(গ) **বাজারের মাছওয়ালারা** হাত দিয়ে সিঙ্গিমাছ ধরে।

(ঘ) একটা **সাপ ঝাঁপি** থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল।

৯। লিঙ্গ পরিবর্তন করো:

সাপুড়েনী, মাসী, মাইজী, বাঁদর, ভদ্রলোক, দিদি।

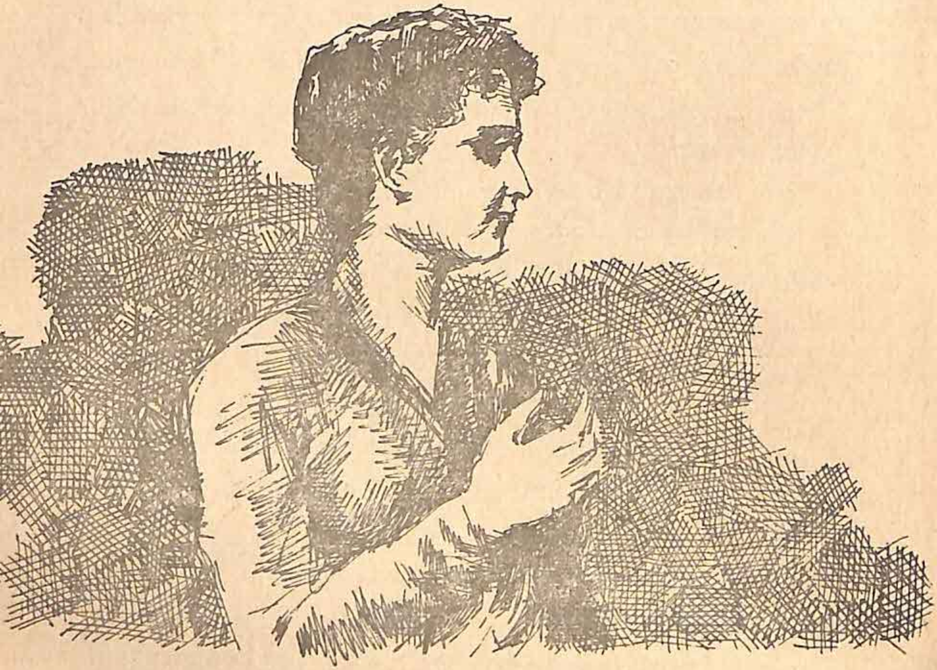
১০। সাধুভাষায় লেখো:

অত কাছে একটা সাপ দেখে আমারও ভয় করছিল। ছোট মাসী ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'শিগগির ওটাকে তুলে নিতে বল্।'

হেলেন কেলার

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯২২-) ঃ জন্ম—কলকাতা। পিতা দুর্গানন্দ। সাংবাদিক ছিলেন। শিক্ষকতা ও সমাজসেবায় নিযুক্ত আছেন। ছোটদের জন্য গল্প উপন্যাস পাঠ্যবই লিখেছেন।



হেলেন কেলারের জীবনী একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর মত।

আমেরিকার একটি ছোট শহরে প্রায় এক শতাব্দীরও আগে হেলেন কেলারের জন্ম হয়। মা আর বাবার কোল আলো ক'রে ছিলেন হেলেন। কিন্তু তা কেবল এক বছরের জন্যে। স

হাঁটিহাঁটি পা পা শুরু করেছেন হঠাৎ একদিন এক রহস্যময় অসুখ তাঁর দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি আর বাক্‌শক্তি একই সঙ্গে কেড়ে নিল।

যে মেয়ের ছ'সাত মাস বয়সেই আধো আধো বুলি ফুটেছিল তার বাক্‌রোধ হল! মেয়ের এই অবস্থা দেখে মা আর বাবা যেন হতবাক হয়ে গেলেন।

হেলেন কয়েকবছর মায়ের স্নেহের গণ্ডির মধ্যেই মানুষ হতে লাগলেন। সেই সময় থেকেই হেলেনের মনে নবজীবনের চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

সেই তাগিদে বাবা ক্যাপটেন আর্থার কেলার আমেরিকার বস্টন শহরের অন্ধ-বিদ্যালয় পার্কিন্‌স ইনস্টিটিউট থেকে হেলেনের জন্যে একজন শিক্ষিকাকে নিয়ে এলেন। ইনিই সেই স্নেহময়ী অ্যান মান্‌স্‌ফিল্ড সুলেভান যিনি অসীম অধ্যবসায় আর ভালোবাসার জোরে হেলেনকে অন্ধ-বিদ্যালয়ে ভর্তি করবার মতো তৈরি করতে পেরেছিলেন।

দশ বছর ধরে এই প্রস্তুতি পর্ব চলার পর, ষোল বছর বয়সে হেলেন অন্ধ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন।

অন্ধদের ব্রেল-প্রথায় শেখানো হয়। সেই প্রথামত হাত দিয়ে অনুভব ক'রে অক্ষর চেনান হয়। হেলেনের মুশ্‌কিল ছিল তিনি যে শুধু অন্ধ ছিলেন তা-ই নয়, তিনি তারও পর মূক এবং বধিরও ছিলেন। ফলে তাঁর শিক্ষিকাকে রোজই হেলেনের সঙ্গে গিয়ে স্কুলের পড়া বুঝে নিতে হত এবং তারপর হেলেনকে বোঝাতে হত।

বাবা, মা, শিক্ষিকা আর পরিবেশের সকলের স্নেহ-মমতার সঙ্গে মিশেছিল হেলেনের অসাধারণ মনোবল আর মেধা।

এইভাবে তিনি বি. এ. পাস তো করলেনই। ইংরেজি ছাড়াও তিনি শিখে নিলেন গ্রীক, লাতিন, ফরাসী এবং জার্মান ভাষা। সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য হল সর্বজনবিদিত। বই পড়া আর লেখাই

হল তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। তাঁর লেখা, 'আমার জীবন কথা' একটি অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টি।

লেখা পড়া ছাড়া অন্য আর একটি বিষয়ে তাঁর অনুভূতি ছিল সব সময় জাগ্রত। সেটি হল অন্ধ, মূক ও বধিরদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা। তাদের জন্যে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে গেছেন।

হেলেন তাঁর জীবনীতে লিখেছেন ঃ 'আনন্দের ঐসব মিষ্টি দিনগুলো বেশিদিন থাকল না। পাখির গানের মতো ছোট এতটুকু একটি বসন্ত, ফুলে ফলে ভরা একটি গ্রীষ্ম আর সোনালি রোদের মতো একটি শরৎ—ছট্‌ফটে আনন্দে উচ্ছল একটি শিশুর পায়ের কাছে তাদের সমস্ত রূপ যেন উজাড় ক'রে উপহার দিয়ে চলে গেল। তারপর দেখা আর শোনার শক্তি কেড়ে নিয়ে এক নিষ্ঠুর রোগ আমাকে সদ্যোজাত শিশুর মতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে গেল।'

হেলেন কেলার তাই বিশ্বের দরবারে যখন পরিচিত হলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। হেলেনের অপূর্ব চরিত্রবল দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। মানুষ যত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সেই বিচারে হেলেনের জায়গা প্রথম সারিতে।

অনুশীলনী

১। হেলেন কেলারের জীবনী কেন একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতো? নিজের ভাষায় আট থেকে দশটি বাক্য লিখে বোঝাও।

২। কত বছর বয়সে হেলেন মূক-বধির এবং অন্ধ হয়ে যান?

৩। তাঁর শিক্ষিকার নাম এবং তিনি কিভাবে হেলেনকে শিক্ষিত ক'রে তোলেন লেখো।

মামার খেলা

[নাটিকা]

সুকুমার রায়

মামা বললেন, 'আয়, একটা নতুন খেলা খেলবি আয়।' শুনে সবাই দৌড়ে এসে ঘিরে বসল, 'কি খেলা, মামা ?'

মামা। এ খেলার নিয়ম খুব সহজ, কিন্তু খেলতে হলে খুব হুঁশিয়ার হওয়া চাই। নিয়ম হচ্ছে এই যে, সবাই যেমন ইচ্ছে কথা বলতে পারবে, কিন্তু এক-একটা অক্ষর বাদ দিয়ে।

সবাই। সে আবার কিরকম ?

মামা। এই মনে করো যেন 'ক' বলব না—এমন কোন কথাই বলব না, যার মধ্যে 'ক' আছে। যেমন—কলা, কৃপণ, হাল্‌কা, বাক্স এসব কিছুই বলতে পারব না।

পটলা। এ আর মুশকিল কিসের ? এসব না বললেই হল।

মামা। না বললে তো হলই, কিন্তু না বলে পারিস কি না দেখ্ তো।

পটলা। আচ্ছা বেশ, এই দেখ আমি 'ক' বলব না—

মামা। আচ্ছা আয় দেখি, আমার সঙ্গে গল্প কর্। আমিও 'ক' বলব না। এই খেলা আরম্ভ হচ্ছে—ওয়ান টু থ্রি।—হ্যাঁরে পটলা, তুই এখন বোধোদয় পড়িস্ ?

পটলা। বোধোদয়! সে তো কোন্ কালে—এই যা! 'ক' হয়ে গেল। আচ্ছা দাঁড়াও, আবার বলছি। বোধোদয় আমি অনেক-দিন হল—

হারু, বিশু, কালু। অ্যাঁ! 'অনেক' বললে যে!

পটলা। ও তাই তো! আচ্ছা বলছি—বোধোদয় আমার বহুৎদিন হল শেষ হয়েছে—এখন চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়ছি।

মামা। বেশ, বেশ, খুব বলেছিস। পড়াশুনো বেশ চলছে তো? না রোজ মাস্টারমশাই মার লাগান।

পটলা। ইস্! তা বৈ—বাস্ রে, বড্ড সামলে গেছি। না মারবেন কেন?—দুত্তরি! এ ছাই খেলা।

হারু। আমি খেলব, মামা—আমি 'ল' বলব না।

মামা। বলবিনে? আচ্ছা, আমি এক্ষনি বলাচ্ছি তোকে। আমিও 'ল' বাদ দিলাম—ওয়ান টু থ্রি। হ্যাঁরে হারু, তুই মাথা মুড়িয়েছিস্ কেন?

হারু। ওটা—ওটা নাপিত কামিয়ে দিয়েছে।

মামা। নাপিত কামড়িয়ে দিয়েছে কেন?

হারু। না, কামড়িয়ে নয়—কামিয়ে।

মামা। ও, কামিয়ে? কি দিয়ে? কাস্তে দিয়ে?

হারু। না, ক্ষুর দিয়ে—

মামা। বেশ, বেশ। তা কিরকম ক'রে কামায় একটু বুঝিয়ে দে তো, সবাই শুনুক।

হারু। এই একটা বাটির মধ্যে খানিকটা—ঐ যা! দাঁড়াও বলছি—খানিকটা water দিয়ে তারপর একটা চামড়ার ওপর ক্ষুর ঘষে ঘষে ধার দিয়ে, কচ্ কচ্ ক'রে—হুঁ—কচ্ কচ্ ক'রে—

পটলা। কচ্ কচ্ ক'রে চালিয়ে দিল।

বিশু। বুলিয়ে গেল। না, তা হলেও হয় না—

হারু। কচ্ কচ্ ক'রে সব সাবাড় ক'রে দেয়।

মামা। বেশ, বেশ, এই তো, চমৎকার হচ্ছে। হুঁশিয়ার থাকা চাই আর চট্‌পট্ কথা যোগান চাই। আচ্ছা, তোর বড়দা আসবে কবে?

হারু। (মাথা চুলকাইয়া) এই—আজকের দিনের পরের দিন।

মামা। দুপুরের ট্রেনে বুঝি ?

হারু। না, বিকেল—ঐ যা! 'ল' হয়ে গেল।

কালু। আমি খেলব। আমি 'য' বলব না।

মামা। তার চেয়ে বল্ না, হয়ে-ময়ে 'ক্ষ' বলব না। সব গোল চুকে যায়।

কালু। তাহলে কোন্‌টা বলব না, বলে দাও।

মামা। আচ্ছা, 'ন' বলিস্‌নে। আয় দেখি—ওয়ান টু থি। খেলাটা বুঝতে পেরেছিস্ তো ?

কালু। হ্যাঁ।

মামা। কি রকম বুঝেছিস্ বল্ তো—

কালু। খুব ভালো।

মামা। (ভ্যাংচাইয়া) খুব ভালো! তুই কথা বলতে শিখেছিস কবে থেকে ?

কালু। ছেলেবেলা।

মামা। আর এই বুড়োবেলায় বুঝি বোবামি শিখেছিস ?

কালু। ধ্যাৎ!

মামা। এটা দেখি আচ্ছা ট্যাঁটা—মুখ বুজেই থাকবে। ওরে একটু কথা-টথা বল্, চুপ ক'রে থাকলে কি কথা হয় ?

কালু। (অনেক ভাবিয়া) মামা, তুমি কি খাও ?

মামা। তোমার মাথা খাই। গাধা কোথাকার! বলি, ঝগড়ার সময় কি তুই ঘাড় গুঁজে চুপ ক'রে থাকিস্ ?

কালু। উহুঁ।

মামা। কি করিস্ তাহলে ?

কালু। ঝগড়া করি।

মামা। ঝগড়াটা কিরকম শুনি—(জিভ কাটিয়া) হ্যাঁ, কিরকম বল্ তো!

সকলে তুমুল চিৎকার—'ন' বলেছে—মামা 'ন' বলেছে—মামা কালুর সঙ্গে হেরে গেছে!

মামা। যা! তোদের আর খেলাটেলা কিচ্ছু শেখাব না— তোরা বেজায় ফচ্‌কে হয়েছিস।

অনুশীলনী

১। কথা নিয়ে এই ধরনের খেলা ক'রে তোমরা দারুণ মজা পেতে পারো। বিশেষ ক'রে 'ম', 'দ', 'চ', 'প' এইসব অক্ষর বাদ দিয়ে খেলায় বেতো শক্ত। তোমরা খেলে দেখতে পারো।

২। পটলা, হারু, বিশু, আর কালুর মধ্যে কাকে তোমার সব চাইতে হুঁশিয়ার মনে হয়েছে? কেন?

৩। হেরে গিয়ে মামার খেলা ভণ্ডুল করাটা তোমার কেমন লেগেছে?

৪। 'খ' অক্ষর ছাড়া দু'টি বাক্য, 'ট' অক্ষর ছাড়া দু'টি বাক্য এবং 'ব' অক্ষর ছাড়া দু'টি বাক্য তৈরি করো।

৫। ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করোঃ

বোধোদয়, পড়াশুনো, মাস্টারমশাই. চারুপাঠ।

৬। বিশেষণ পদে পরিবর্তন করোঃ

ঝগড়া, দিন, রোজ, ছেলে।

নিজে পড়ি

সপ্তম পাঠ

এই সপ্তম পাঠ 'নিজে পড়ি' সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা পাঠ্য বই (reader)। এই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এরই পরিপূরক 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' সপ্তম ভাগ বইটি প্রকাশিত হয়েছে, যেটি অনুশীলনী বা সহায়ক পুস্তিকা (workbook)। বই দু'খানি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে মধ্যশিক্ষা স্তরের ছেলেমেয়েরা সহজে বাংলা ভাষার বিভিন্ন রচনাশৈলী আয়ত্ত করতে শেখে এবং এই ভাষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছ চিন্তা আর সুষ্ঠু ভাব প্রকাশে উৎসাহ পায়।

এই পুস্তকমালার লেখিকা একজন অভিজ্ঞ শিক্ষিকা এবং তিনি এই স্তরের আরো অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এর পরিকল্পনা করেছেন। তার ফলে এই পুস্তকগুলি হয়ে উঠেছে বাংলা শেখার অন্যতম প্রধান ও সর্বাধুনিক পুস্তকমালা।

প্রথম শ্রেণীর আগের স্তরে, অর্থাৎ প্রস্তুতি শ্রেণীর (Preparatory) জন্য কেবল 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' [প্রাথমিকা]-সহ এই পুস্তকমালায় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য দুখানি ক'রে (পাঠ্য ও অনুশীলনী) পুস্তক পরিকল্পিত হয়েছে। আকার ও আয়তন পৃথক হলেও প্রতিটি পুস্তক পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিক ও ক্রমাগ্রসর (graded) পদ্ধতিতে ও নিয়ন্ত্রিত শব্দসমষ্টি (controlled vocabulary) বজায় রেখে এগুলি রচিত হয়েছে।

বাংলা যাদের দ্বিতীয় ভাষা এবং বাংলা যাদের প্রথম বা মাতৃভাষা—উভয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই—মধ্যশিক্ষা স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষায় একই যোগসূত্রে মিলতে পারবে এই পুস্তকমালায়। কারণ এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব স্কুল সারটিফিকেট একজামিনেশন্‌স্ নির্ধারিত বাংলা পাঠক্রম সযত্নে অনুসরণ করা হয়েছে।

Bandyopadhyay, Gita : NIJE PARI [Bengali, Reader VII]
ISBN O 86131 719 X R

1990
15.00